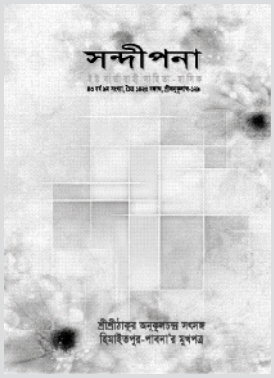

সম্পাদক
ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

নির্বাহী সম্পাদক
শ্রীজগদীশ দেবনাথ

সম্পাদনা সহযোগী
শ্রীতাপসকুমার রায়
tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

ঢাকা কার্যালয়
১৪০/১ শাঁখারী বাজার
ঢাকা-১১০০।

চট্টগ্রাম কার্যালয়
২৭ দেওয়ান্‌জী পুকুর লেন
রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০৩১-২৮৬০৭১১
মোবাইল: ০১৭১৪-৩১০২০৩
০১৮১৯-৩১২৫১৮

প্রধান কার্যালয়
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
হিমাইতপুর-পাবনা
ফোনঃ ০৭৩১-৬৫৫২৩, ৬৫১৬৪
মোবাইলঃ ০১৭১৫-৫৩৪২০৭ (সম্পাদক)
০১৯১১-৭৮৮১৩৯ (সম্পাদনা সহযোগী)
০১৭১৮-১৫২৩৪৪ (অফিস)
E-mail: satsanghimaitpur@yahoo.com

বাণিজ্যিক যোগাযোগ
শ্রীঅনিশচন্দ্র ঢালী
০১৭১৯-৭৫৩৪৭৪

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠা সজ্জা
আমিনুল ইসলাম
প্রিন্ট মিডিয়া, প্রেসপট্টি, বগুড়া

সন্দীপনা

ই ষ্ট বা র্তা বা হী সা হি ত্য - মা সি ক

৪৩বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, মার্চ-এপ্রিল'১৭ খ্রিঃ, শ্রীঅনুকূলাব্দ ১২৯

অপকৃষ্ট যা'রা অসমর্থ যা'রা,
তা'দের সঙ্গে মেলামেশা-ব্যাপারে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে যতই অপসারিত ক'রে তুলবে–
ত'াদের শ্রদ্ধোৎসারিনী ভজনানন্দ-উদ্যোগ
ততই শিথিল হ'য়ে উঠবে,
দাবী ও প্রত্যাশাপ্রলুব্ধতায়
শ্রেয়ের প্রতি শীলতাহারা ঘৃণ্যানুচলনশীল
হ'য়ে উঠবে ত'ারা–
জাহান্নম-পথযাত্রী হ'য়ে
যোগ্যতার অনুশীলনী অভিগমনকে ব্যাহত ক'রে,
তাই, তা'দের স্বাধ্যায়ী চলনকে
ব্যাহত ক'রো না,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে
ঝাপ্‌সা নৈকট্য-মলিন ক'রে তুলো না,
নিজেরা অত্যন্ত সুলভ ও সস্তা হ'য়ে
তা'দের শ্রেয় সঙ্গলাভের প্রলোভনকে
নষ্ট ক'রে
উন্নতির পথকে রুদ্ধ ক'রে তুলো না,
আবার, অযথা মহার্ঘ্যও হ'য়ে উঠো না।
(সদ্‌বিধায়না-১৩৫)
–শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

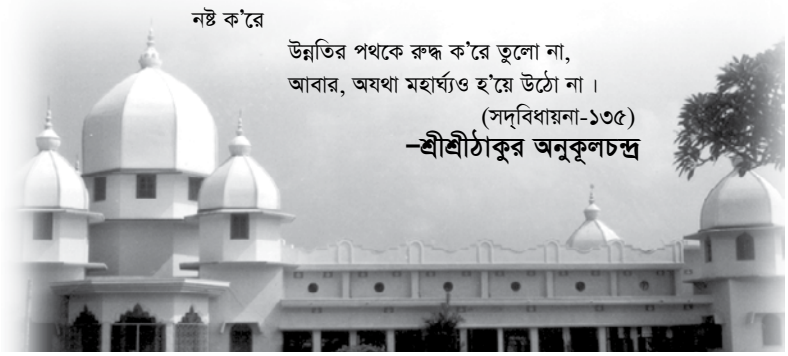

সূচিপত্র

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ৩
দিব্যবাণী ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ৭
মাতৃদীপনা- সেবা-বিধায়না ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ১০
ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ১২
শিশু কথা ঃ শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৪
বাক-বিভায় বার্ত্তিক বিগ্রহ: শ্রীশ্রীঠাকুর ঃ প্রলয় মজুমদার ১৮
মানসতীর্থ পরিক্রমা ঃ সুশীল চন্দ্র বসু ২৩
প্রেমল ঠাকুর ঃ প্রলয় মজুমদার ২৫
আমি তোমাকে ভালোবাসি ঃ জগদীশ দেবনাথ ২৯
চিরঞ্জীব বনৌষধী–বিম্বীঃ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ৩৪
সৎসঙ্গ সমাচার ৩৭
প্রার্থনার সময়সূচি ৪০

অনলাইনে 'সন্দীপনা' পড়তে ভিজিট করুন–
www. srisrithakuranukulchandrasatsang.com/pages/publications

"ঝড়া পাতা গো আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রু জলে
ফাগুন দিলে বিদায়মন্ত্র আমার হিয়া তলে ॥"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতসমূহকে নিয়ে যে বিষয়সূচী রচনা করেছিলেন– 'গীতবিতানে'-ই সেটি সুসম্পৃক্ত। এরই একটি পর্ব হলো 'প্রকৃতি'। প্রারম্ভিকায় উচ্চারিত গানটি 'প্রকৃতি'র মধ্যেই চিহ্নিত।

প্রকৃষ্টভাবে কর্মতৎপরতাই প্রকৃতির বিধান। সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে– সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই 'প্রকৃতি'। সত্ত্বাদি প্রকৃতি যেন বীজ। এই বীজ বৃক্ষ থেকে বিশ্ব ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগে চতুর্থ শ্লোকে ভগবান বলছেন ঃ

"ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥"
–'মাটি জল আর আগুন বাতাস
মন, বুদ্ধি অহঙ্কার আকাশ
আট প্রকৃতি আমার প্রকাশ।'

এই মহাগ্রন্থের নবম অধ্যায়ে ১০ম শ্লোকে শ্রীভগবান তাঁর পরম-কারণ সত্তাবিষয়ে আত্মপ্রকাশ করছেন–

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃসূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ততে ॥"

–মহাবিশ্বের অধ্যক্ষ হচ্ছেন স্বয়ং পরমপুরুষ। তিনি তাঁর একান্ত সখা– অর্জুনকে শোনাচ্ছেন ঃ হে কুন্তিপুত্র অর্জুন! আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা প্রকৃতি এবং যা-কিছু সৃষ্টি করে চলেছে। এই কারণেই জগৎ বারবার পরিবর্তিত হচ্ছে।

– 'অর্জুন! আমারই অধ্যক্ষতায়
প্রকৃতি সব সৃষ্টি করে।
সেই কারণেই সারা জগৎ
বিবর্তনের রূপটি ধরে ॥'

বাংলা বর্ণমালায় হ্রস্ব-ই এবং দীর্ঘ-ঈ যেমন আছে তেমনি আছে– হ্রস্ব-উ এবং দীর্ঘ-ঊ। শব্দের এই উচ্চারণ-ভেদ এদের অর্থ ভেদও প্রকাশ করে। আমরা এখন 'উ' 'ঊ'–বর্ণ দুটি নিয়ে একটু ভাবি হ্রস্ব মানে খাটো, দীর্ঘ মানে লম্বা। সংস্কৃত ব্যাকরণ বলছেন– 'একমাত্র ভবেদ্ হ্রস্ব, দ্বিমাত্রা দীর্ঘোচ্চরে'। স+উ=সু, সু+ঊ=সূ। দুটিকে নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ব্যাকরণের বগ্‌বগানি ছেড়ে একটি ছোট গল্প বলি। পুণ্যভূমি দেওঘরধাম। পূজা উৎসব সমাপ্ত। নানা স্থানের ভক্তেরা অনেকে নিজ ঘরে ফিরেছেন। বিগত দিনগুলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল বাংলোর ভেতরে অবস্থান করছিলেন। এদিন সকালেই তিনি বড়াল-বাংলোর বাইরে উন্মুক্ত অঙ্গনে শুভ্র শয্যায় অবস্থিত। বহিরাগতেরা তেমন কেউই নেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি স্বগোতোক্তি– 'সুযোগ হলেই ভালো হয়'। সেবাপ্রাণা একজন মা জিজ্ঞাসা করলেন– 'বাবা কী বল্লেন?' শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন ঃ 'সুযোগ হলেই ভালো হয়, তাই বল্লাম'। পূর্ব-পাকিস্তান আমলে এই আমার দ্বিতীয়বার দেওঘরধামে আসা। বাক্যটির সহজার্থ আমার কাছে বোধগম্য হয়নি। এখনও বলি–

সু-যোগ মানেই সুন্দরে যোগ
সু-যোগ হলেই ভালো হয়।
তাঁর করুণার অসীমতায়
আনতে পারে দিগ্বিজয়॥

'সু'-যোগ মানে প্রসবিতা– সুজননের সাফল্য জগৎকে কল্যাণপ্রসূত করুক। পরমপ্রভুর জয়জয়াকার হোক। বন্দেপুরুষোত্তমম্॥

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

সঙ্কলয়িতাঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস; এম এ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

২৫শে পৌষ, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ৯/১/১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় চৌকিতে ব'সে আছেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছেন অনেকে। ফিলান্থ্রপী অফিসে কাজকর্ম্ম হ'চ্ছে। আশ্রমের সকালকার তরকারীর বাজারে কিছু কিছু কেন-বেচা চল্‌ছে। ডিস্‌পেন্সারীতে কেউ কেউ ওষুধপত্র নিতে এসেছেন। কলতলায় জল তোলা হচ্ছে। কেষ্টদার বাড়িতে আলাপ-আলোচনা চলছে। নিভৃত-নিবাসের পাশে ইট-কাঠ জড় করা হ'চ্ছে বাড়ি তৈরির জন্য। কারখানা ও অন্যসব জায়গায়ও কাজকর্ম্ম চলছে। আশ্রমময় একটা শান্ত কর্ম্মস্রোত ব'য়ে চলেছে। এরই মাঝে শোনা যাচ্ছে গ্রাম্য পরিবেশে পাখির কূজন, গৃহপালিত জীবজন্তুও বিচিত্র আনন্দ-কল্লোল। সম্মুখের বিরাট প্রান্তর ও আশ্রমভূমি যেন মাধুর্য্যে মগ্ন হ'য়ে আছে চিরমধুরকে বক্ষে ধারণ ক'রে।

স্পেন্সারদা ও হাউসারম্যানদা এখন কী করবেন, যতীনদা (দাস) সেই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর–ওদের যেসব note (লেখা) দিয়েছি, সেইগুলি যদি work out (সম্পাদন) না করে, তবে শুধু মনে-মনে বুঝলে হবে না। Apply (প্রয়োগ) না করলে wisdom (প্রজ্ঞা) হয় না। ওদের অনেক সম্পদই আছে, খাটালে হয়। Conflict (সংঘাত)-এর মধ্যে পড়লে, কে কেমন behave (ব্যবহার) করে, সেইটে হ'লো বড় কথা। দ্বন্দ, দুঃখ, কষ্ট, অপমান, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি হজম করতে অনেকখানি ক্ষমতা লাগে। টান না থাকলে মানুষ তা' পারে না। কাজের প্রথম কথা হ'লো, সে কিছুতেই ছিটকে পড়বে না। যত প্রতিকূল অবস্থাই আসুক না কেন, তাকেই adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে favourable (অনুকূল) ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে। তার ভিতর-দিয়েই মানুষ grow করে (বেড়ে ওঠে) সব-রকম অবস্থার মধ্যে প'ড়ে যে নিজেকে ইষ্টানুকূলে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে শেখে, সেই জানে, কেমন ক'রে মানুষকে ঐ পথে চালাতে হয়। আর কাজ মানেই তো ঐ।

এরপর লিমিটেড কোম্পানী সম্বন্ধে কথা উঠলো। –একটা কোম্পানীর নাম দিলেন–'দি লাইগেট', তার ম্যানেজিং এজেন্ট এর নাম দিলেন– 'কেরিয়ার এ্যান্ড কোং', কাগজের নাম দিলেন– 'ওরাকেল'। যতীনদা এ সম্বন্ধে প্রধান্তঃ দায়ী থাকবেন, এমনতর অভিমত ব্যক্ত করলেন।

আর একটা কোম্পানীর নাম দিলেন–'দি নিউ এরা পাইওনিয়ার্স লিমিটেড', ম্যানেজিং এজেন্ট্‌-এর নাম দিলেন–'দি হোলি মেসেঞ্জারস্‌ কোং' এবং বীরেনদার (মিত্র) উপর এর পরিচালনার ভার থাকলে ভাল হয় ব'লে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

এরপর শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) ও বঙ্কিমদার (রায়) সঙ্গে শ্রীশ্রীবড়মার দালান এবং নিভৃত-নিবাস-গঠন-সম্বন্ধে আলোচনা হ'লো। সেই কাজ করুক, সব সময় তীক্ষ্ম নজর রাখতে বললেন।

২৭ শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ১১/১/১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারাসন্দায় সভা আলো ক'রে ব'সে আছেন। সকলে মহানন্দে ঘিরে বসেছেন তাঁকে। মধুময়ের সান্নিধ্যে জীবনের তিক্ততা ও গ্লানির অপনোদন করছেন। সতুদা (সান্যাল), স্পেন্সারদা, হাউসারম্যানদা, বারেনদা (রায়) প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহজ লীলায়িত ভঙ্গীতে প্রশ্নাদিও উত্তর দিয়ে চলেছেন। আর সকলেই তা' আগ্রহভরে শুনছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন–প্রতিলোম বিবাহ হ'লে সন্তান-সন্ততির মুর্গীর মত অবস্থা হয়। একটাকে কাটলে আর একটা মনে করে–ওকে কাটলো; তাতে আমার কি? এইভাবে যে প্রত্যেকেই কাটা পড়ে তা' আর বোঝে না। অতটুকু দূরদৃষ্টি থাকে না। থাকবে কী ক'রে? স্বার্থান্ধ হ'লে স্বার্থের পূরণ হয় যাতে, তা' আর মানুষ করতে পারে না। স্বার্থান্ধ হওয়া মানে, নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলা। ওকেই বলে obsession (অতিভূতি)। এরা কিছুতেই সংহত হ'তে পারে না। সংহত হ'তে গেলে আদর্শের কাছে, নীতির কাছে যদি নতি না থাকে, তাহ'লে তা' হবে কী ক'রে? পিতামাতা যেখানে আদর্শ ও নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সন্তানের কাছ থেকে সেখানে আর কী আশা করতে পার? ওদের make up (গঠনই) হয় সত্তাবিরোধী রকমে। তাই চেষ্টা ক'রেও ওদের ভাল করা যায় না। ভাল করার মত metal (ধাতু) না থাকলে ভাল করবে ফাঁকে? ওদের ভাল তো করা যায়ই না, বরং ওদের সান্নিধ্যে সৎ যারা তাদেরও

অধোগতি অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে । তাই শাস্ত্র ও সমাজ ওদের বাহ্যজাতি ক'রে রেখেছে । এটা যে ঘৃণা বা বিদ্বেষ-প্রসূত তা' নয়কো । আত্মরক্ষার জন্যই এই বিধান । এতখানি কড়াকড়ি যদি না থাকতো, তবে সব গোলাঘন্ট হ'য়ে যেত । সাচ্চা মাল একটাও খুঁজে পাওয়া যেত না । আজকাল গেড়ামির বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হয়েছে, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ গোঁড়ামির প্রয়োজন যে কতখানি তা ব'লে শেষ করা যায় না । মনু বলেছেন,– "যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকা:, রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্‌রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ।" আমাদের সমাজ ও শাস্ত্র প্রতিলোমকে যেমন প্রতিরোধ করেছে, অনুলোমকে তেমনি উৎসাহিত করেছে । অনুলোমে হয় হায়নার মত–একটার গায় হাত দিলে আর সবগুলি ছুটে আসে তার প্রতিবিধান করতে ।

স্পেন্সরদা–Superior instincts (উৎকৃষ্ট সংস্কার), inferior instincts (নিকৃষ্ট সংস্কার) বুঝব কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–যে যত Fulfilling (পরিপূরণী) সে তত superior (উন্নত), fulfilling (পরিপূরণী) হ'লে আবার adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় ।

স্পেন্সারদা–কে decide (ঠিক) করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–মানুষই decide (ঠিক) করবে, হাতায়ে দেখা লাগে ।

রঙ্গিল দৃষ্টি নয়কো যখন
আগ্রহনত মন,
এমন মনই ধরতে পারে
সংস্কার কেমন ।

Unbiassed (পক্ষপাতহীন) অথচ interested (অনুরাগী) হওয়া চাই । একজন পারশব যদি fulfilling (পরিপূরণী) হয়, তবে তাকে তোমার-আমার সবার গিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছা হবে ।

শৈলমা মায়েদের মধ্যে একপাশে বসেছিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখে বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললেন–এ কিডারে? ঝাঁকের কই কখন আসে' ঝাঁক মিশে গেছে আমি ঠাওরই পাইনি ।.. তা' হেমপ্রভার ওখান থেকে একপাক ঘুরে আসলি নাকি?

শৈলমা হেসে বললেন–আজ আমার তেমন ক্ষিদে নেই ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–ক্ষিদে থাক, তোমার একটা কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে তো? ওরা এত কষ্ট ক'রে করছে ।

শৈলমা–যা' বলেছেন ঠাকুর! আমি ঐ ভেবে না খেয়ে পারি না ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (মাথা দুলিয়ে)–তা' তো ঠিকই । (সকলের হাস্য) ।

প্রফুল্ল–ঠাকুর! সাধারণতঃ দেখা যায়, প্রবৃত্তির পরিপূরণ যারা করে, তারা লোকের প্রিয় হয় ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–প্রবৃত্তির পরিপূরণ নয়, বাঁচাবাড়ার পরিপূরণ যারা করতে পারে, তারাই মানুষের সত্যিকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করে । সে গল্প জান তো? এক ছিল মাসী, সে তার বুনপোকে খুব লাই দিত । বুনপো মিথ্যা কথা বলুক, চুরি করুক, সব-তাতেই তাকে লাই দিত, সমর্থন করতো, শেষটা একদিন সে চুরির দায়ে ধরা পড়লো । Judge (বিচারক) তাকে জেল দিয়ে দিল । সে তখন মাসীকে ডেকে বলল–মাসী, আমি তো চ'লে যাচ্ছি, যাবার আগে তোমার কানে-কানে একটা গোপন কথা ক'য়ে যাব । মাসীও সরল বিশ্বাসে এগিয়ে আসলো । বুনপো তখন খচমচ ক'রে মাসীর কান কামড়ে দিল । মাসী উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলো । তখন সেই বুনপো বলল–তুমি আমাকে লাই দিয়ে-দিয়ে তো এই অবস্থায় এনেছ, গোড়া থেকে আমাকে যদি শাসন করতে, তাহ'লে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হ'তো না ।... সবাই সেই কথা শুনে অবাক্ । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বহু নেতা মানুষের প্রবৃত্তিতে উস্কানি দিয়ে তাদের কাছে popular (প্রিয়) হ'য়ে ওঠে, কিছুদিন বাদে হয়তো আবার দেখা যায়, লোকের হাতে তাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না । কিন্তু নেতার যদি নেতা থাকে, সে যদি তাঁকে অনুসরণ করে, আত্মনিয়ন্ত্রণ করে এবং তাকে যারা অনুসরণ করে তাদেরও যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে পরিচালিত করে, তাহ'লে কিন্তু এমনতর বিড়ম্বনা সইতে হয় না । সকলেরই ভাল হয় ।

প্রবৃত্তির উন্মেষ কেমন ক'রে হয়, এরপর সেই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'লো ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–মানুষের থাকে আত্মপোষণ, আত্মরক্ষণ ও আত্মবিস্তারের ইচ্ছা । তার জন্যই প্রয়োজন হয়–আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা । এইগুলির conflict (দ্বন্দ্ব)-এর ভিতর-দিয়ে আবার আসতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, প্রবৃত্তিগুলির যতক্ষণ সঙ্গতি থাকে, ততক্ষণ সেগুলি দোষের কিছু নয় । কিন্তু দোষের ব্যাপার হ'য়ে পড়ে যদি আমরা সেগুলির দ্বারা obsessed (অভিভূত) হ'য়ে পড়ি ।

স্পেন্সরদার কাছে সব ইংরাজীতে তর্জ্জমা ক'রে বলা হ'চ্ছে, স্পেন্সারদা সব বুঝে নিতে চেষ্টা করছেন । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–অভিভূতি কেমন ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর–Complex (প্রবৃত্তি)-গুলি যদি meaningfully adjusted (সার্থকভাবে সুনিয়ন্ত্রিত) না হয়, তবে being (সত্তা) যেভাবে inclined (আনত) হয়, তখন তুমি সেই মানুষ হ'য়ে ওঠ । আর-একটা impulse-এ (সাড়ায়) হয়তো আর-একজন হ'য়ে গেলে । সত্তা প্রবৃত্তির দ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়ার ফলে এক গাঁজেল, কখনও generous (উদার) । প্রবৃত্তির অভিভূত হ'লে নিজের উপর আর নিজের কোন অধিকার থাকে না, প্রবৃত্তিই আমাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় । আবার for the principle (ইষ্টের

জন্য) না হ'লে, ভালই হোক, মন্দই হোক, সবই obsession (অভিভূতি) । একজন হয়তো নিজের খেয়ালমত পরোপকার ক'রে বেড়াচ্ছে, ও-ও একরকম প্রবৃত্তি-অভিভূতি । ভাল করতে যেয়ে মন্দ করছে কিনা তা' আর ভেবে দেখে না । পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে মন যখন যেমন বলে তেমনি করে, personality (ব্যক্তিত্ব) distintegrated (বিচ্ছিন্ন) হ'য়ে পড়ে । Impulse (সাড়া)-ই complex (প্রবৃত্তি) যখন পেয়ে বসে তখন ঘাড়ে-ধ'রে নিজেদের কাজ হাসিল করিয়ে নিতে চায় । তাই, unsurrendered (অদীক্ষিত) অবস্থায় রেহাই নেই । প্রবৃত্তির তোড়ের সঙ্গে তখন বুঝবে কে? Surrender (আত্মসমর্পণ) চাই-ই, যাকে বলি আমরা দ্বিজত্ব । বাইবেলেও আছে born again (পুনরায় জাত) ব'লে ।

স্পেন্সারদা–গুরুকে ভালবাসলেই তো হ'লো, দীক্ষার প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর–সব ব্যাপারেই formal acceptance (লৌকিক গ্রহণ) চাই । নারী-পুরুষের মধ্যে ভালবাসা যতই থাক না কেন, যদি তারা বিয়ে না করে, তাহ'লে কিন্তু একের অন্যকে সওয়া-বওয়ার বুদ্ধি আসে না । আবার দীক্ষার ভিতর-দিয়ে কায়দাটা জানা যায়–যাতে ক'রে গুরুর উপর ভালবাসাটা বৃদ্ধি পায় ।

এমন সময় প্রমথদা (দে) আসলেন ।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি খেজুরের রস খেয়েছ?

স্পেন্সারদা–একদিন খেয়েছি, ভাল । গুড় আরো ভাল ।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে বললেন–আপনি ওদের রস-গুড় দুই-ই ভাল ক'রে খাওয়ায়ে দেবেন ।

একটু পরে আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বললেন– আমাদের দেশ poor (গরীব) হ'লে কী হবে, ঐশ্বর্য্য কিন্তু কম নেই ।

স্পেন্সারদা–ভারতবর্ষ তথা বাংলা সত্যই উপভোগ্য স্থান ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে)–তাইতো কত কবি এর স্তুতি ক'রে গেছেন । এ দেশের কথা যত ভাবি, আমারও অন্তর স্তুতিতে ভ'রে ওঠে ।

পাবনা থেকে আগত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সদাচার-সম্পর্কে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–প্রসাব ক'রে জল নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা-সম্পর্কে আমার প্রথম বিশেষ ক'রে খেয়াল হয় কলকাতায় । ৭টা সিফিলিসের রোগী দেখলাম । তাদের সিফিলিস্ হয়েছে সিফিলিস্-রোগীর হাতে জল খেয়ে । জলের মধ্যে খারাপ কিছু থাকলেও অনেক সময় প্রসাব সেটা বের ক'রে দিতে চায় । জল না নিলে ঐ দূষিত প্রসাবটা লেগে থাকে, তারপর যদি কোন কারণে ঐ স্থানে ছাল যায়, তবে ঐ দূষিত জিনিসটা রক্তের সঙ্গে মিশে সিফিলিস্ হবার সম্ভাবনা থাকে ।

ভদ্রলোক বললেন–আমরা তো অতো ভাবিই না ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–সবটা আমাদের ভাবনার মধ্যে আসে না ব'লেই তো যাঁরা আমাদের জন্য ভেবে আচার-নিয়ম ঠিক ক'রে দিয়ে গেছেন, তাঁদের নির্দেশমত চলা ভাল ।

২৮ শে পৌষ, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ১২/১/১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন । অমূল্যদা এসে প্রেসের কাজকর্ম্ম-সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয় জেনে গেলেন । যদি দৈনিক খবরের কাগজ বের করতে হয়, তাহ'লে কী-রকম ধরনের প্রেস হ'লে ভাল হয়, সেই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হ'লো ।

জলপাইগুড়ির একটি ভাই বললেন–ঠাকুর! আমার হজম হয় না, পেটে বায়ু হয়, অনেকরকম ওষুধপত্র করেছি, কিছুতে কিছু হয় না । আমার মনে হয়, আপনি নিজমুখে যদি কিছু ব'লে দেন, তাহ'লে বোধ হয় আমি রোগমুক্ত হ'তে পারি ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–রাঁধুনি, জোয়ান, গোলমরিচ, পিপুল, বিটলবণ, হলুদের গুঁড়ো অল্প-অল্প পরিমাণ নিয়ে একত্র বেঁটে বড়ি ক'রে রেখে দুই বেলা খাওয়ার পর একটা ক'রে বড়ি খেয়ে দেখলে হয় ।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনান হ'লো ।

আশ্রমে একটি মা-র কৌটা মিল্কোর দরকার । আমেরিকানদের দেওয়া 'মিল্কো' প্রমথদার কাছে আছে । শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বললেন– প্রমথদার কাছে যেয়ে বল্ গিয়ে ।

তাতে মা-টি বললেন– আমি বললে দেবে না, আপনি ব'লে দেন ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–যদি দেওয়ার মত থাকে, তুই বললেই দেবে । আমাকে দিয়ে যদি সব কাজ করিয়ে নিতে চাস্, তাহ'লে তাতে তোদের লাভ নেই । নিজেরা কিছুই শিখবি না, কিছুই জানবি না । একটা মানুষের অনুকম্পা লাভ করতে গেলে কী ভাবে তার সঙ্গে কথা বলা লাগে, তা' শিখতে হয় । আর, শুধু কাজের বেলায় মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করলে হয় না । স্বভাবতঃই মানুষের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করতে হয় । আমাকে দিয়েই যদি সব করিয়ে নাও, তবে এ-সব প্রয়োজনবোধ থাকবে না । কা'রও সঙ্গে হয়তো দুর্ব্যবহার করবে, পরক্ষণে তাকে দিয়ে কোন কাজের প্রয়োজন হ'লে আমাকে দিয়ে তাকে বলিয়ে কাজটা করিয়ে নেবে । তুমি যদি জান যে, মানুষটাকে পর ক'রে দেওয়া চলবে না, হারান চলবে না, আমার ঠাকুরের জন্য আমার পরিবেশের জন্য, আমার জন্য তার সাহায্য-সেবা যে-কোন সময়, আমার প্রয়োজন হ'তে পারে, তাহ'লে তুমি কিন্তু নিজেকে অনেকখানি সামলে চলবে, এইভাবে হবে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ । তোমাদের নিজেদের চলনা যদি এইভাবের হয়, তাতে তোমাদেরও সুবিধা, আমারও সুবিধা । এতে আমারও একটা আত্মপ্রসাদ থাকে । আমি তো আর চিরকাল খোঁচা ভরবার জন্য ব'সে থাকব না ।

পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে ডাকালেন।
প্রমথদা আসলে বললেন–দেখেন প্রমথদা! এই মা কয়, প্রমথদা আমাদের জন্য তো ঢের করে, আমার বলতেও সমীহ হয়, উনি যদি এক কৌটা 'মিল্কো' দিতেন তাহ'লে বড় উপকার হ'তো।
প্রমথদা খুশি মনে বললেন–তা' দিচ্ছি, তার জন্য কি? আমাকে বললেই তো হ'তো।
শ্রীশ্রীঠাকুর–তাই তো! বোঝে না, বেকুব আর কা'রে কয়?
শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁর চৌকির পাশ ঘিরে বসেছেন।
নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে।
স্পেন্সারদা–অহং কী?
শ্রীশ্রীঠাকুর–যে-কোন impulse (সাড়া)-এর conflict (সংঘাত)-এর ভিতর প'ড়ে যা' নিজেকে assert (জোরের সঙ্গে ঘোষণা) করে to exist (বাঁচতে), তাই-ই ego (অহং), অহং ভালও নয়, মন্দও নয়–অহং অহং।
স্পেন্সারদা–Ego (অহং) surrendered (নিবেদিত) হ'লে কেমন অবস্থা হয় তার?
শ্রীশ্রীঠাকুর– Ego (অহং) surrendered (নিবেদিত হ'লে strengthened (শক্তিমান) হয় এবং unaffected (অপরামৃষ্ট) থাকে। 'তোমারই গরবে গরবিনী হাম।' তখন গর্ব্ব হয় তাঁকে নিয়ে। 'সকল গর্ব্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।' তাঁর গর্ব ছাড়তে চায় না।
স্পেন্সারদা–Surrender (আত্মসমর্পণ) হ'লেই complete (পরিপূর্ণ) হয়। তা' যত সময় না হয়, তত সময় পর্য্যন্ত intention to surrender (আত্মসমর্পণের অভিপ্রায়)। ও হ'লো কসরত। দেশলাইয়ের কাঠি যদি damp (ভিজে) থাকে, তাড়াতাড়ি জ্বলে না। বার-বার ঘষতে হয়, সেইরকম stage (অবস্থা)-টাই intention to surender (আত্মসমর্পণের অভিপ্রায়)। হয় যখন একলহমায় হ'য়ে যায়। তাঁকে ভাল লেগে গেলে আর কি কোন কথা আছে? সত্তাটা হুঙ্কার দিয়ে ওঠো তাঁর জন্য। তাঁকে বাদ দিয়ে কিছু নিয়ে আর তৃপ্ত থাকতে চায় না। তাতে আর রসই বা কি? সুখই বা কি? আর সার্থকতাই বা কি? মাছ যেমন জলের মধ্যেই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে–ডাঙ্গায় তুললে হাঁপিয়ে ওঠে, তারও তেমনি হয়–ইষ্টকে বাদ দিয়ে আর-কিছুতে সোয়াস্তি পায় না। ঐ ক্ষুধাটুকু জাগাই বড় কথা। When there is the hunger of unification, there is no more damp and it flares up immediately. The Augustine matchstick was hungry and it flares up immediately. The Augustine matchstick was hungry and it flared as soon as it struck against the saint-box (মিলনের ক্ষুধা যেখানে উদগ্র, সেখানে কোন আর্দ্রতা থাকে না, এবং তা' পট ক'রে জ্ব'লে ওঠে। অগাষ্টিনরূপে দেশালাইয়ের কাঠিটি ক্ষুধার্ত্ত ছিল, এবং সাধুরূপ দেশলাইয়ের সঙ্গে ঘষা লাগতেই তা' দপ ক'রে জ্বলে ওঠলো)। আমরা যখন কোন জিনিস ছাড়ি, একটু-একটু ক'রে ছাড়ব–তা' হয় না! কাটি তো এক কোপে, ঘেঁসড়ে-ঘেঁসড়ে কাটা হয় না।
প্রফুল্ল–আপনার ছড়ায় আছে–

'একটু ক'রে ধীর চলনে
হয় না অভ্যাস এস্তামাল,
অমন ক'রে চললে বাড়ে
ব্যর্থ বেফাস কুজঞ্জাল;
যা' করবি তুই বুঝলি মনে
এক ঝাঁকিতে কর তাহা,
সমানে চল সেই চলনে
এমনি চলাই ঠিক রাহা।'

শ্রীশ্রীঠাকুর (খুশির সঙ্গে)–ছাওয়াল কয়েছে বেশ। এক-একসময় এক-একটা অচমকা যখন শুনি তখন মনে হয় না যে আমি কইছি ওগুলি। হ্যাঁ, এক ঝাঁকিতে না করলে হয় না। ভিতরে সম্বেগ না থাকলে একটা বদ্ধমূল বদাভ্যাস ছাড়া যায় না, কিংবা একটা নূতনতর সদভ্যাসও করা যায় না। আমি রসগোল্লা যখন ছাড়লাম, একদিনেই ছেড়ে দিলাম। তিন বছরের মধ্যে রসগোল্লা আর খাইনি। আস্তে আস্তে ছাড়তে চাইলে আর ছাড়তে পারতাম কিনা সন্দেহ। ইচ্ছার জোর থাকলে মানুষ সব পারে, এবং লহমাতেই পারে। যারাই বড় হয়, তাদের মধ্যেই দেখা যায় এই ইচ্ছার জোর, সঙ্কল্পের জোর। তাইতো রত্নাকর বাল্মীকি হ'তে পারে। মানুষ যা'ই হোক, যা'ই করুক, তার ভরসার এইটুকু যে, সে চাইলেই নিজেকে change (পরিবর্ত্তন) ক'রে ফেলতে পারে। ইষ্টপ্রাণ হ'লে তার ভালমন্দ সব-কিছুরই একটা re-adjustment (নতুন সমাবেশ) হয়, তখন কোনটাই আর ভাল বই খারাপ করে না।
একটি দাদা বলছিলেন–নিরিবিলিতে থাকতে বড় ইচ্ছা করে।
শ্রীশ্রীঠাকুর–নিরিবিলি হ'লেও মনের কাছ থেকে রেহাই নেই। বাইরে নিরিবিলি না খুঁজে মনের দিক্ দিয়ে নিরিবিলি হ'লেই ভাল হয় এবং সেইটাই দরকার। আর, conflict (সংঘাত)-এর মধ্যে না থাকলে, activity (সক্রিয়তা)-র মধ্যে না থাকলে, strain ও pressure (কষ্ট ও চাপ)-এর মধ্যে না থাকলে কিন্তু মানুষ grow করতে (বাড়তে) পারে না।
এরপর সুরমা–মা, সুকুমারীমা, কালীষষ্ঠীমা প্রভৃতির সঙ্গে রান্নাবাড়া-সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন।

দিব্যবাণী
(বিধি-বিন্যাস)
–শ্রীশ্রীঠাকুর

যা'র দ্বারা তুমি পরিপূরিত হ'চ্ছ
পরিপালিত হ'চ্ছ
তাঁ'কে বিহিত পরিচর্য্যায় প্রতিপালন কর,
সম্বর্দ্ধনী অনুবর্ত্তনায় চল–
দায়িত্ব নিয়ে
দক্ষতার সহিত
কুশল-কৌশলে;
বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রে
অনুশীলন কর
যা'তে তোমার জীবনে
তিনি সার্থক হ'য়ে ওঠেন–
সৎ-সন্দীপনায়;
যা'ই কর, যেমনই হও,
যত বিজ্ঞতাই তোমাতে থাক্ না কেন,
তুমি কৃতার্থ হ'তে পারবে না। কিছুতেই–
যদি ঐ মৌলিক নীতিকে অবহেলা কর,–
বিপাক, বিধ্বস্তি, অভাব-অনটন
তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ ক'রবে না;
সম্পদের যত মহীরুহই
সৃষ্টি কর না কেন
ধ্বংসে পড়বেই তা',
আর, তা'র চাপে তোমার জীবন
সংশয়াপন্ন হ'য়ে উঠবে,
প্রবৃত্তির খেল
দোল দিয়ে তোমায়
জাহান্নমেই সমাধিলাভ করাবে,
বুঝে চ'লো। ৮৭।
তুমি যখন সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপরায়ণ,
ইষ্টস্বার্থই
তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ হ'য়ে উঠেছে,
তুমি যা' কর, যা' ভাব
সবটার ভিতর-দিয়ে
ঐ স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাই
তোমার কাছে
কাম্য ও ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠেছে,
তাঁ'র উপচয় ও উদ্বর্দ্ধনই
তোমার উদ্বর্দ্ধনী-জীবন-কিরীট
স্বতঃ ও সলীলভাবে,
যে-মুহূর্ত্তেই তোমার জীবন
তদর্থে রূপায়িত হ'য়ে উঠলো,
তোমার পালন-পোষণ, ভরণ-পূরণ, সুখ-দুঃখ
তাঁ'তেই ন্যস্ত হ'য়ে উঠলো স্বাভাবিকভাবে–
বোধিদীপা হ'য়ে,
তখন তাঁ'র অন্নে
তোমার সত্তা পরিপালিত হবে–
সুখ-দুঃখকে বরণ ক'রে,
বিচলিত না হ'য়ে তা'তে,
বিলাস ও ব্যসনবিলোল না হ'য়ে,–
এটা কিন্তু স্বাভাবিক ;
জলই যা'র জীবন
তা'র তা'তে জীবনধারণ করা–
পাপের তো নয়ই, বরং পুণ্যের। ৮৮।

স্বতঃ এবং স্বাভাবিকভাবে
তা'র দ্বারাই
পরিপোষিত হবার অধিকার জ'ন্মেছে তোমার,
যা'কে পোষণ ক'রবার স্বার্থ
সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী হ'য়ে
তোমাকে পেয়ে ব'সেছে সর্ব্বতোভাবে
উপচয়ী ক'রে ;
যে তোমার গলবিগ্রহ,
তুমি তার গলগ্রহ নও,
বরং নন্দনার নিত্য-অনুচর। ৮৯।
অযাচিতভাবে
প্রত্যাশারহিত হ'য়ে
প্রীতি-অবদানস্বরূপ মানুষ যদি কিছু দেয়,
তা' গ্রহণ না ক'রলে
পিতৃপুরুষ বিশীর্ণ হ'য়ে ওঠেন,
এবং অগ্নি পিতৃলোকসহ
তা'দের জন্য
হব্য অর্থাৎ পোষণবর্দ্ধনী উপাদান
বহন করেন না ;

ব্রহ্মা ব'লেছেন,
অমনতর দান
দুষ্কর্ম্মকারীর নিকট হ'তেও গ্রহণ করা যায়,
কারণ, মানুষ
মানুষের ক্ষোভশূন্য অবদানেই বেঁচে থাকে
–দিয়ে, নিয়ে,
ভগবান্ মনু ব'লেছেন–
"আহৃতাভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদপ্রচোদিতাম্ ।
মেনে প্রজাপতির্গ্রাহ্যামপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ ।
নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ।
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে॥" ৯০ ।

শোকে অনেক সময় সহানুভূতিসূচক,
উৎসাহ-উদ্দীপী, ভরসামণ্ডিত ধাক্কা
সহজে শোকসন্তাপকে ক্ষীণ ক'রে তোলে,
শোকসংক্ষুব্ধ যে
তা' হ'তে বেশী
সহানুভূতিসূচক শোকবিহ্বলতা
শোক-প্রশমনের অনেকখানি সহায়ক–
যদি তা' বাস্তব অনুভূতির অনুভূতিসম্পন্ন হয় । ৯১ ।

সময়ই সুপ্রশমক । ৯২ ।

গুণে, দর্শনে ও ব্যবহারে
যা' সুন্দর,
সুখপ্রদও হ'য়ে থাকে তা' সাধারণতঃ । ৯৩ ।
যে-সুযোগ, সঙ্গতি বা সম্বন্ধ
শুভফলপ্রসূ হ'য়ে থাকে,
আপাতদৃষ্টিতে দুঃখের হ'লেও
তা' কিন্তু মাঙ্গলিক পন্থাই,
বর্দ্ধনারও ঐ পথ । ৯৪

আকস্মিক লাভ,–
তা'র যখন বিলয় হয়,
তা'ও অকস্মাৎই হ'তে দেখা যায় । ৯৫ ।

তুমি যদি অযথা
মানুষের দুঃখের কারণ হ'য়ে ওঠ,
এবং নানাপ্রকার সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
তা'দিগকে দুর্দ্দশা-জর্জ্জরিত ক'রে তোল,
তেমনি ক'রেও
নিজে অনুতপ্ত না হ'য়ে
বরং আত্মগৌরব অনুভব ক'রে থাকে,–
বুঝে নিও, তোমার অবস্থা শোচনীয় ;
তেমনতর অবস্থায় যতক্ষণ না প'ড়ছ
এবং প'ড়ে তোমার সাত্ত্বিক অনুবেদনা
তা'কে উপলব্ধি না ক'রছে–
সত্তা ও স্বচ্ছন্দতায় মমতাদীপ্ত হ'য়ে,–
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার নিস্তার নেই,
তুমি মানুষের দুঃখের কারণ হ'য়েই চলবে ;
দেখেও যদি না শেখ,
ক'রেও যদি না শেখ,
ঠেকেও যদি না শেখ,
দেখবে–
শাতনের শীতল জৃম্ভণ
বায়ুকে বিষাক্ত ক'রে
ডাইনী-আকর্ষণে তোমাকে আকৃষ্ট ক'রতে
অচিরেই তোমার দিকে এগিয়ে আসছে । ৯৬ ।

যা'র লোকসান বা দুঃখের
ভাগীদার হ'তে চাও না
বা দায়িত্ব নাও না–
তা'র লাভ বা সুখের ভাগীদার হ'তে গেলে
তা'কে দুঃখ দেওয়াই হবে ;
তৃপ্তি পাবে না তোমাকে দিয়ে সে,
তা'র পোষক না হ'য়ে
শোষকই হ'য়ে উঠবে তুমি,
তাই, তা' চৌর্য্যবৃত্তিই তোমার,
ও-প্রচেষ্টার পরিণাম দুঃখই,–
হিসাব ক'রে চ'লো । ৯৭ ।

দুঃখ পেয়ে যা'রা
ভগবান্‌কে দোষারোপ করে,
চাহিদানুগ কৃতি-চলনই যে
তা'দের অমনতর ক'রে তুলেছে–
তা' যারা ভাবতেও চায় না,
বুঝতেও চায় না,
অথচ ঈশ্বরকে দোষারোপ ক'রে
নিস্তার পেতে চায়–
ঈশ্বর-অনুধ্যায়িনী চলনকে অবজ্ঞা ক'রে,–
তা'রা হয়ও না,
পায়ও না,

বঞ্চনার ঐশ্বর্য্যই
সমৃদ্ধ ক'রে তোলে তা'দের। ৯৮।
যাঁ'কে আঁকড়ে ধ'রে
দুঃখের নিশা অতিক্রম ক'রে–
সুখের ঊষায় ছেড়ে দিয়েছ
আবর্ত্তনে সে-দিন এলে
তাঁ'কে ধ'রে জীবন-পথে চলা
দুর্গমই হ'য়ে উঠবে তোমার,
'বিদায় দিয়েছ যা'রে নয়নজলে
এখন ফিরাবে তা'রে কিসেরই ছলে' ? ৯৯।
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যা'তে যেমন কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে–
কৃতী পরিচর্য্যা নিয়ে,
উপচয়ী অনুশীলনায়,–
তোমার জীবন
সুখীও হ'য়ে চ'লবে তেমনি–
সুকেন্দ্রিক প্রীতি-অনুচর্য্যায়
তোমার প্রিয়কে সুখী ক'রে,
কৃতার্থ হ'য়ে ;
এই হ'চ্ছে সুখী হওয়ার
ও জ্ঞান লাভ করার শ্রেয়-পন্থা। ১০০।
মনে রেখো–
যেমনতর সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তুমি তোমার পরিবার, পরিবেশ
ও পরিস্থিতিকে নিয়ে
বিনায়িত সমবায়ী সঙ্গতিতে
যেমনতর হ'য়ে
যতখানি সার্থক হ'য়ে উঠতে পেরেছ–
বোধি ও ব্যক্তিত্বে,
কিংবা বিকেন্দ্রিক ছন্নতায়
সপরিবেশ যেমন
বিশৃঙ্খল ও অবিন্যস্ত হ'য়ে উঠেছ–
বোধি ও ব্যক্তিত্বের অপলাপে,
তুমি মানুষও তেমনি,
সুখী বা দুঃখীও তেমনি–
তা' তুমি যখন যে-অবস্থায়ই
থাক না কেন। ১০১।
দুঃখের গুণ
যা'কে মানুষ অগুণ বলে,
তা' যদি তোমাতে
আধিপত্য বিস্তার ক'রে না থাকে–
তুমি দুঃখ পাবে কী ক'রে ?
এতে শুধু তুমিই যে দুঃখ পাবে–
তা' নয়,
ওগুলি সংক্রামিত হ'য়ে
পরিবেশকেও দুঃখের ভাগী ক'রে তুলবে ;
আবার, সুখের গুণগুলিও অমনতর,
ঐ গুণ যদি তোমাতে
অন্বিত সঙ্গতির সলীল চলনে
চলৎশীল থাকে,
দুঃখের ভিতরও সুখ তোমাকে
প্রীতি-চর্য্যায়
উল্লসিত ক'রে তুলবে,
শুধু তা'ই নয়,
তা' আবার পরিবেশে সংক্রামিত হ'য়ে
তোমার প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধিকে
স্ফুটতর অর্ঘ্য-অবদানে
পূজা ক'রে চ'লতে থাকবে ;
যেটা চাও–
সেই গুণে
স্বতঃ হ'য়ে চল,
তর্পিত বা বিদগ্ধ হবে। ১০২।

একটুখানি চোখ রাখুন

ইষ্টপ্রাণ দাদা/মায়েরা, সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার লক্ষ্যে আপনার বার্ষিক বকেয়া গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করুন। সেই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করুন।

-সম্পাদক

মাতৃদীপনা

(মায়েদের জন্য বিশেষ সাহিত্য আসর)

সেবা বিধায়না

–শ্রীশ্রীঠাকুর

যে সাহায্য করে
তা'র আপূরণ-তৎপর না হ'য়ে
তা'র কাছে সাহায্য প্রার্থী হ'য়ে
যে বা যা'রা পুনঃপুনঃ উপস্থিত হয়,
প্রায়শঃই দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত,
উৎসাহহীন, লোকচর্য্যাহারা
চাহিদা-উদগ্র জীবন নিয়ে
চ'লতে থাকে তা'রা;
তাই, যেখানে পাও,
যা' পেলে
তা'র উপর দাঁড়িয়ে
লোকচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে
লোক প্রীতিভাজন হ'য়ে ওঠ,
আর, প্রীতি-অবদানের ভিতর-দিয়ে
যা' পাও
তৃপ্তির সঙ্গে তা' গ্রহণ ক'রো,
তোমার বোধি সক্রিয় সঙ্গতি-সম্বন্ধ হ'য়ে
শ্রীদীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে–
নিস্পন্নতার আত্মপ্রসাদে
প্রসাদমণ্ডিত ক'রে। ১৬০।

যা'কে দাও,–
তা' অজচ্ছল উচ্ছলস্রোতাঃ হ'লেও
সে যদি কদর্য্যচেতাঃ হয়,
তা'র অপকৃষ্ণ প্রবৃত্তি
আরো প্রাপ্তির প্রলোভনে
তোমাকে বিব্রত ক'রে তুলতে
কসুর ক'রবে কমই,–
এটা প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়;
তোমার দান
গ্রহীতাকে সুক্রিয় ক'রে
স্বতঃ-অনুধ্যায়ী সামর্থ্যানুশীলন-তৎপর ক'রে
তোমাকে দেওয়ায়
উৎসারিত ক'রে তোলে যদি,
তবে সে-অবদান
তোমার ক্ষতির কারণ হ'য়ে ওঠে কমই;
যেখানে তোমার দান
তার দান-প্রবৃত্তিকে গজিয়ে তোলে না,
অনুধ্যায়িনী বিবেচনায়–
কেন তা' করে না–
নিরূপণ ক'রে,
যেমন করণীয়
তা' করো;
ফল কথা, যা'ই কর,
প্রতিপদক্ষেপেই
আত্মরক্ষণী প্রস্তুতি নিয়ে চলাই ভাল,
যদিও
লোকবর্দ্ধনাই তোমার তপঃ। ১৬১।

যা'রা সাধ্যমত দেবার তালে
তৎপর না হ'য়ে
তা'কে সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলতে থাকে,
অথচ নেবার তদ্বির করে
নানা ভাবভঙ্গীতে,–
তা'রা ঐ লোভলোলুপতার
সন্ধিৎসা-অভিব্যক্তি নিয়ে চ'লতে থাকে;
তা'দের পাওয়া যে নিতান্তই
সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়;
যেখানে দেওয়া নাই–
মানুষের আগ্রহ-অনুকম্পা
সেখানে শিথিল হ'য়ে চ'লতে থাকে;
চাও তো
সাধ্যমত যেখানে যেমন পার–
তা' দিতে ত্রুটি ক'রো না,
প্রাপ্তিও
তোমার দিকে এগুতে থাকবে–
ক্রম-পোষণায়। ১৬২।

নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থেকো না,
বিহিত চলনায় চল–
ইষ্টার্থ-অনুদীপনা নিয়ে,
স্বার্থ-প্রত্যাশা-লুব্ধ না হ'য়ে,
কুশল করণ-যজ্ঞে
অনুপ্রেরিত ক'রে সবাইকে;
যা'তে লোকের সত্তা
উপযুক্তভাবে সব দিক্ দিয়ে পোষণ পায়,
পরিপালিত হয়–
বিহিতভাবে তা' কর–সঙ্গে-সঙ্গে;
তোমার সঙ্গ ও সাহচর্য্যে
তৎপর-পরিচর্য্যায়
তোমার পরিবেশ যদি
ইষ্টার্থ-অনুবেদনী অন্তরলাস্যে
আত্মপ্রসাদ-অনুকম্পায়
তোমাকে অভিনন্দিত করে,
উচ্ছসিত হৃদয় ও কণ্ঠে যদি ব'লে ওঠে–
'তোমাকে নিয়ে আমরা সুখে আছি',
তা'ই কিন্তু তোমার সার্থকতা,
তা'ই তোমার যোগ্যতার
হোম-আহুতি,
তা'ই তোমার জীবনীয় অর্জ্জন;
এতটুকু স্মরণ রেখো,
বাস্তব চলনায় তেমনি চ'লো,
দুর্দ্দশা যেমনই হো'ক
আর যা'ই হো'ক,
আত্মপ্রসাদে বঞ্চিত হবে কমই । ১৬৩ ।

তুমি যা'কে পছন্দ কর না,
তা'র অনুচর্য্যাও
কমই ভাল লেগে থাকে তোমার–
বিশেষ বাধ্য-বাধকতা ছাড়া;
তাই, তুমি
অনুচর্য্যী অনুকম্পা নিয়ে
যা'দের সেবা-তৎপর হ'য়ে উঠতে চাও,
প্রথমে সৎ-অভিনন্দনা নিয়ে
শুভ-অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
তা'দের হৃদ্য হ'য়ে উঠতে হবে তোমাকে–
আচরণে, বাক্যে, ব্যবহারে,
উপচয়ী সুব্যবস্থ মিতি-চলনে,–
যা'তে তোমাকে পেয়ে
তা'রা তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে,
হৃদ্য অনুপ্রাণন-আবেগে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে;
তখন তোমার ঐ অনুচর্য্যা
সেবা-যজ্ঞে সার্থক হ'য়ে উঠে
তোমাকে মহিমা-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে;
নয়তো, যা'ই কর না কেন
গোড়ায় গলদ র'য়েই যাবে,
তা' জীবনীয় হ'য়ে উঠবে না
কা'রও কাছে । ১৬৪ ।

পরিচর্য্যা-পরিশ্রম-কাতর
যত হ'য়ে উঠবে–
দক্ষতা বা ক্ষমতাও তত
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বোধ-বিন্যাস ও ব্যবস্থিতিও তত
ঐ সঙ্কীর্ণতা লাভ ক'রবে–
অপটু হ'য়ে;

আবার, বিহিত অবদানে
যতই কৃপণ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
ইষ্টানুগ ইষ্টার্থ-বিনায়িত আত্মনির্ভরশীলতাকে
যতই অবজ্ঞা ক'রে চ'লবে,
পরমুখাপেক্ষী যতই হবে,
পর-প্রত্যাশী যতই হবে,–
নিষ্পন্নতা ও পরাক্রম-প্রবণতাকে
ততই হারাতে থাকবে,
বোধ, ক্ষমতা ও দক্ষতার
সুসঙ্গত শালিন্যের অভাবে
তোমার ব্যক্তিত্বও তত
যোগ্যতায় শিথিল হ'তে থাকবে,
যোগ্যতা-সন্দীপী ফন্দি-ফিকিরও
দুর্ব্বল হ'য়ে চ'লতে থাকবে;
যেমন চাও,
তেমনি ক'রে চ'লতে থাক । ১৬৫ ।

ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো

(অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড)

–শ্রীশ্রীঠাকুর

ইষ্টার্থেরই আপূরণায়
যে-নেশাটি ছাড়লি না,
ব্যক্তিত্ব তোর সেই নেশাতে
সেটাও কি তুই বুঝলি না?
চর্য্যারত তা'তেই তুমি
তেমনতরই চলৎশীল,
তা'তেই তোমার র'বেই যে আঁট
অন্য কিছু তেমনি ঢিল । ৩৮ ।

স্বার্থসেবার ফন্দী নিয়ে
আত্মদানের অছিলায়
নানান ধাঁজের রূপ নে' চলে
স্বার্থপোষী উচ্ছলায়,
পুণ্যপ্রদীপ অন্তরে তা'র
অন্ধতমেই নিভে যায়,
ইতোভ্রষ্ট-স্ততোনষ্টে
জীবনটাকে সে-ই হারায়,
বৃত্তিই তা'র ধৃতি হ'য়ে
মৃতিপ্রব্রণ মর্ষণায়,
এলোমেলো হ'য়ে সে-জন
স্বস্তিটাকে হারায়ই হারায় । ৩৯ ।

সেবা

নিষ্ঠা-ভক্তি প্রেষ্ঠতেই হয়
কৃতিচর্য্যী উন্মাদনায়,
শ্রেয়ত্ব গায় জীবনের জয়
সেবানিপুণ তৎপরতায় । ১ ।

নিষ্ঠা নিয়ে আচার্য্যসেবা
করিস্ দেখে-শুনে,
করার বুঝটি এমনিই হবে
বাড়বি ক্রমিক গুণে । ২ ।

গুরুর ব্যথা ক'রলি না বোধ
ক'রলি না তার নিরসন,
এমনতর কৃতি-চলায়
ক'রবে কি তোয় বিচক্ষণ? ৩ ।

পোষণ নেওয়া, পোষণ দেওয়া
বাড়িয়ে তোলা জীবন-স্রোত,
অসৎ-নিরোধ ক'রে চলা–
সত্তা-সেবার চারটি বোধ । ৪ ।

সওয়া-বওয়ার মাধ্যমেতে
লুকিয়ে থাকে স্বস্তি-জয়,
সহা-বহা ক'রেই থাকে
শিষ্ঠ, শুভ আর অভয় । ৫ ।

লোকবর্দ্ধনী অনুসেবন
ধৃতিচর্য্যার মূলধন,
ধৃতিচর্য্যায় দক্ষ যেমন
বিভব হবে সেই মতন । ৬ ।

জীবন যা'দের ঊর্জ্জীতপা
ঊর্জ্জী-কৃত নিয়ে,
তা'রাই বাঁচায় দেশ-পরিবার
হৃদয়-চর্য্যা দিয়ে । ৭ ।

প্রত্যাশাহীন পরিচর্য্যা
প্রত্যাশাহীন আপ্যায়ন,–
এমনতর ব্রতী চলনে
প্রীতির পূজা হয় সাধন । ৮ ।

চলা-বলা-করায় তোমার
চালটি প্রীতিদক্ষ হ'লে,
আপ্যায়নী পরিচর্য্যায়
সবাই তেমনি উঠবে ফুলে । ৯ ।

ঠিক বুঝিস্ তুই সব খতিয়ে
জীবন-দাঁড়াই পরিবেশ,
তুইও তেমনি তাঁদের দাঁড়া
তুই-ই তা'দের সুনিবেশ । ১০ ।

সুষ্ঠু-সুন্দর সেবাচর্য্যা,
সত্তাপোষী আদান-প্রদান
আপৎকালে পরিচর্য্যা–
সৎ-অন্তরেরই শুভ আধান । ১১ ।

খোঁজ-খবর যা'র রাখবি যত
উপকারের সন্ধানে,
চর্য্যারত উচ্ছালতায়
বাঁধবি তেমন বন্ধনে । ১২ ।

আপদ্-বিপদ্ দেখলে কা'রো
দেখলে ঠেকা কোনোখানে,
সজাগ চোখে বুঝে-সুঝে
নিয়োগ হ'বি তেমনি টানে । ১৩ ।

অসুখ-বিসুখ-দুর্ঘটন-আদি
সাধ্যের অতীত কা'রো যখন,
ফুলতালের উদ্দীপনায়
রাখবি তা'রে তেমনি দীপন । ১৪ ।

হৃদয় দিয়ে চর্য্যা-চলায়
জয় করিস্ তুই যা'কে,
বান্ধবতায় বদ্ধ সে যে
পাবিই সাড়া ডাকে । ১৫ ।

অনুকম্পায় চর্য্যাপ্রতুল
যতই তুমি ক'রবে হ'য়ে,
লোকেই বইবে তোমার বোঝা
তা'দের চর্য্যা চল ব'য়ে;
সুসংহত হ'য়ে উঠবে
সেবানিপুণ বর্দ্ধনায়,
তাই তো তোমার আত্মপ্রসাদ
তোমার প্রীতির মুর্চ্ছনায় । ১৬ ।

সাত্বত সঙ্গতি দেখবে যেথায়
বোধ-চক্ষুর দীপ্তি দিয়ে,
সেইটে-ই নেবে শিষ্ট চর্য্যায়,–
সার্থক হ' না তাই নিয়ে । ১৭ ।

কুটুম্ব হয় তা'রাই কিন্তু–
ধারণ-পালন-পোষণ দিয়ে
পারস্পরিক বাঁধন আনে
চর্য্যাদীপ্ত হৃদয় নিয়ে । ১৮ ।

ভজন-তেজা ব্যক্তি যা'রা
চর্য্যা-সেবা-অনুরাগে,
দূরকেও জানিস্ আপন করে
পরকেও তা'রা আগলে রাখে;
এমন ধরা এমন করা
এমন চর্য্যা-অনুরাগ,
অমৃতেরই আশীর্ব্বাদ সে
সম্বর্দ্ধনার সুষ্ঠু যাগ । ১৯ ।

দেওয়া-নেওয়া-ধরায় কিন্তু
দেখবে পরও আপন হয়,
নেওয়ার তরে মোসাহেবী
দুর্ভাগ্যেরই গাহে জয় । ২০ ।

দেওয়া-নেওয়ার মিলনতালে
যেখানে যেমন শিষ্ঠ-শুভ,
প্রীতি-উচ্ছল উৎসর্জ্জনাও
হ'য়েও থাকে তেমনি ধ্রুব । ২১ ।

পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ায়
সত্তাপোষী অর্থনায়–
যেখানে যা'র যেমন লাগে
ছাড়ে-রাখে প্রয়োজনায় । ২২ ।

পরিবেশের দেওয়া-নেওয়ায়
বাঁচাবাড়ার উর্জ্জনা,
তেমনতরই হয়ই সেথায়
যেমন কৃতির সর্জ্জনা । ২৩ ।

পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
কৃতিপূর্ণ আবেগ নিয়ে,
সৎ-উচ্ছলায় চ'ললে পরে–
ধৃতি ওঠে দীপ্ত হ'য়ে । ২৪ ।

শিশুকথা

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শিশুর মানসিকতা

অনেক বাবা-মা মনে করেন, আড়াই-তিন বছরের শিশু কী আর বোঝে। তাই, তারা ঐ শিশুর সামনেই অসংযত চলনে চলেন, অসতর্কভাবে কিছু খারাপ কথা বলে ফেলেন। শিশুটিরও যে একটি ব্যক্তিত্ব আছে, চিন্তাশক্তি আছে, তা' অনেকক্ষেত্রে খেয়ালই করা হয় না। কিন্তু শিশুর মন চমৎকার আয়নাস্বরূপ। অপরকে অনুকরণ করতে সে ওস্তাদ। যে কোন কথা বা ব্যবহার তার মনে সুন্দরভাবে দাগ কেটে ব'সে যায়। গুরুজনের কথা ও আচার তার ভিতরে কার্বন কপি হ'য়ে যায়। এইভাবেই শিশু ভাল বা খারাপ ব্যবহার শিখে ফেলে অল্প বয়সেই। বড় হ'লে সে তার পরিবেশে ঐ শেখা কথা ও আচারেরই প্রয়োগ করতে থাকে।

তেমনি আবার, শিশুর সামনে যদি তার মা-বাবা ঝগড়া-বিবাদ করে, তার ফল হয় খুবই খারাপ। এটা ঠিকই যে, ঝগড়া ও কথা-কাটাকাটির সময় স্বামী-স্ত্রী কারোরই মাত্রাজ্ঞান থাকে না। হয়তো একে অন্যকে দোষারোপ ক'রে চালাতে থাকে অহং-এর গুঁতোগুঁতি। একে অপরকে সহ্য ক'রে নিতে নারাজ হয়ে ওঠে। হয়তো উভয়েরই মুখ দিয়ে অনেক অবাঞ্ছিত কুৎসিত গালিগালাজ বেরিয়ে আসে। ছোটরা ওগুলি শুনে শুনে রপ্ত ক'রে নেয়। তা' ছাড়া, সন্তানের চোখে বাবা-মা সাধারণতঃ অনেক বড় হ'য়ে থাকেন। যখন সে দেখে, মা বাবাকে মোটেই গ্রাহ্য করে না এবং বাবারও কোন দরদ নেই মায়ের উপর, তখন সেও আর তাদের শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারে না। তার অন্তর-জমিনের স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, শ্রদ্ধার অঙ্কুরগুলি থেঁতলে, দুমড়ে-মুচড়ে যেতে থাকে। যাকে সে ভক্তির আসনে বসিয়ে পূজা করতে চায়, তাকে নামিয়ে দিতে হচ্ছে একেবারে রাস্তার ধূলায়। এতে তার মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড বিক্ষোভ। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় শিশুর ভেতরটা গুমরে মরতে থাকে। কাউকে সে এ-কথা বলতে পারে না। যাকে ধ'রে জীবনের উত্থান হবে সেই বৃক্ষটির মূল যখন কাটা প'ড়ে যায় তখন ঐ সন্তান আর কাউকেই শ্রদ্ধা করতে পারে না! শ্রদ্ধার চাষ যেই বন্ধ হ'য়ে গেল, আমনি ঐ কচি মনের ভাবভূমিতে শুরু হয়ে গেল অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও অমান্য করার চাষ। আলোর অভাব ঘটলেই প্রকৃতির নিয়মেই সেখানে চলে আসে অন্ধকারের আধিপত্য। ধূমায়িত হ'তে থাকে বঞ্চনার আপসোস। তারপর একদিন ঐ স্নেহবঞ্চিত জীবনটি খুব সহজেই হয়ে ওঠে রাস্তার গাঁটকাটা বা রকবাজ মস্তান বা লম্পট। তার কারণ বাড়ীর ভিতরে মা-বাবার যে মন কষাকষি বা ঝগড়াঝাটি চলতে থাকে, স্বাভাবিকভাবেই শিশুমনে তা' ভাল লাগে না। ঐসব ঝামেলা থেকে সে রেহাই পেতে চায় এবং সেইজন্যই আশ্রয় খোঁজে। বাইরে। এই আশ্রয়স্থলটি তার জীবনের পক্ষে কতটা সমীচীন বা অসমীচীন তা' চিন্তা করার অবকাশ তার থাকে না। যাহোক একটা কিছুকে ধ'রে সে বাঁচতে চায়। মানুষ মূলতঃ আনন্দের সন্তান। আনন্দই ব্রহ্ম। তাই প্রত্যেকেই বাঁচতে চায় আনন্দের মধ্যে। এড়াতে চায় দুঃখকে। শিশুরা সতেজ কচি প্রাণ। স্ফূর্ত্তির বিকাশ তাদের মধ্যে স্বতঃ ও সহজ। আনন্দের যেখানে খাকতি সেখানে তাদের মন বসে না। তাই, ঘরের মধ্যে যদি আনন্দ না পায়, তারা সে আনন্দ অবশ্যই বাইরে খুঁজে নেবে। অনভিজ্ঞ ও অপরিণত বুদ্ধি হওয়ার জন্য আনন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাদের বোধ তো গজায় না। ফলে, ভুল পথে পা প'ড়ে যেতে পারে। এই হ'ল শিশুদের স্বাভাবিক মনের গতি।

শিশুদের মন বহির্ম্মুখী হওয়ার আরো একটি কারণ আছে। মা-বাবার মনখারাপের জেরটা প্রায়শঃই ঐ কচিকাঁচাদের উপর এসে পড়ে। অকারণে তারা গালাগালি বা মারধোর খায়। লঘু পাপে পায় গুরুদণ্ড। এতে ক্রমশঃ তাদের মন খিঁচড়ে যেতে থাকে। ঐ মা-বাপের সংস্পর্শ তারা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। এমনকি, এর ভিতর দিয়ে ছেলেপেলের গোপনে অন্যায় কাজ করার প্রেরণাও গজায়। তাই, আমরা আবার বলি, ঘরের পরিবেশ যদি সহায়ক না হয়। তবে বাইরের হাজার ভাল ব্যবস্থা শিশুকে প্রকৃত মানুষ করতে পারে না।

শিশুর জীবন সুন্দর ক'রে গড়তে হ'লে শিশুর অভিভাবকদের আগে সৎ ও সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। কারণ, শিশুর অন্যান্য শিক্ষার সাথে-সাথে আর যে জিনিসটা অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয় সেটা হ'ল চরিত্র। চরিত্রের মধ্যে আছে আচার ও আচরণ। অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা ছেলেমেয়েদের ভাল-ভাল নীতি উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা তা' পালন করেন না।

কারো হয়তো ভোরে ওঠার অভ্যাস একেবারেই নেই। তিনি তার ছেলেকে ভোরে ওঠার জন্য হাজার উপদেশ দিলেও তা' কার্য্যকারী হবে না। আমি নিজে বিড়ি খাই, অথচ ছেলেকে বিড়ি খেতে নিষেধ করি। তাতে ছেলে বোঝে যে বিড়ি খাওয়া খারাপ হ'লে বাবা খায় কেন। অতএব গোপনে খাওয়া চলতে থাকে। ছেলেমেয়েদের বাইরে আড্ডা দিয়ে বেড়াতে হয়তো নিষেধ করি, কিন্তু নিজেরা গুরুজনরা পছন্দমত জায়গায় বেশ চুটিয়ে আড্ডা মারি। এতে ছেলেমেয়েরা বুঝবে যে, যা' বলতে হয় তা' করতে হয় না এবং যা' করতে হয় তা' বলতে হয় না। অর্থাৎ, শিশুকাল থেকেই তারা ভাবা-বলা ও করার অসামঞ্জস্য নিয়ে বড় হ'তে থাকে। মন-মুখ এক করার শিক্ষা তাদের কাছে দূর অস্ত হ'য়ে যায়। এতে তাদের ব্যক্তিত্ব হ'য়ে পড়ে দ্বিধাবিভক্ত। এককেন্দ্রিক হ'য়ে সৎ-উদ্দেশ্যে অমোঘ গতি নিয়ে চলা তাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়।

তারপর ধরা যাক, একটি শিশু কোন ক্লাবে যেয়ে আবৃত্তি বা ব্যায়াম শেখে অথবা স্কুলে পড়াশুনা করে। কিন্তু সেখানকার অভিভাবক স্থানীয় দাদামণি ও দিদিমণিদের কারো-কারো মধ্যে আছে হয়তো অবৈধ সম্পর্ক। তাদের আকারইঙ্গিত ও কথার ঢং-এ তা' ফুটে ওঠে। শিশু ভাল আবৃত্তি ও লেখাপড়া শেখার সাথে-সাথে ঐ অশালীন চলনের আদবকায়দাও মস্তিষ্কগত ক'রে নেয় এবং সুযোগমত নিজের ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগও ঘটায়। এইভাবে কোন কোন তথাকথিত 'ব্রিলিয়ান্ট' সভ্য জীবনেও বাঁধভাঙ্গা উচ্ছৃঙ্খলতার একটা 'আণ্ডারকারেন্ট' চলতে দেখা যায়, যা' নাকি ঐ শৈশবকালের শিক্ষারই বাস্তব বিনিয়োজন।

শৈশবে শিশুরা যার কাছ থেকে অনাদর বা তাচ্ছিল্য পায়, বড় হলেও তার সম্বন্ধে একটা চাপা ঘৃণা বা আক্রোশ ঐ-শিশুর মনে লুকিয়ে থাকে। বুদ্ধি দিয়ে বা ভদ্রতার খাতিরে সেটা হয়তো অনেকে চেপে রাখে।

আবার কোন কোন পরিবারে শিশুরা কারণে অকারণে খুব 'থ্যাশিং' (প্রচণ্ড ধমক বা প্রহার) খায় গুরুজনদের কাছে। ছোটবেলায় এই থ্র্যাশিং-এর ফল উত্তরকালে যে কি ক্ষতি করে তা' ঐ-গুরুজনরা জানেন না। এর ফলে, ঐ-শিশুর অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলি দারুণভাবে থেতলে যায়। পরিণত বয়সে তাকে হয়তো দেখা যাবে একটা জড়বুদ্ধি বা সাধারণজ্ঞানবিহীন মানুষরূপে। সূক্ষ্ম ব্যাপারে বা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে কিছুতেই তার মাথা খুলতে চায় না। সেখানে সে কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে পড়ে। লোকের কাছেও সে নিন্দিত এবং উপহাসের পাত্র হয়। জীবনটা তার কাছে হ'য়ে দাঁড়ায় একটা বোঝাস্বরূপ। এইরকম ক্ষেত্রে অনেকে নৈরাশ্যের শিকার হয়ে পড়ে। বহুদর্শী প্রাজ্ঞ পুরুষ এবং দরদী মনণ্ডিকিৎসক ছাড়া তার ঐ মানসিক বিপর্য্যয়ের কারণ আর কেউ ধরতে পারে না। এ যেন একটি চারাগাছকে ভারী কোন কিছুর আঘাত দিয়ে থেতলে বা ভেঙ্গে দেওয়া। ঐ গাছ বাড়ার সময় তার সেই বিকৃতি বা ভাঙ্গা অবস্থা নিয়েই বড় হ'তে থাকবে।

আমরা সাধারণতঃ শিশুদের বহিরঙ্গের উন্নতিসাধনের জন্যই তৎপর থাকি, অর্থাৎ তাদের খেলাধূলা, শরীরের শ্রীবৃদ্ধি, পড়াশুনায় ভাল ফল করা, ইত্যাদির দিকেই লক্ষ্য দিই। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে তাদের মন বলে একটা পদার্থ আছে এবং সেই মনের জগতে তার মতন ক'রে চিন্তার ওঠানামা আছে। তার পছন্দমত ব্যাপার বা বিষয় হ'লে সে খুশি হয়, আর পছন্দ না হ'লে সে বিরক্ত বা দুঃখিত হয়। আমরা বড়রা অনেক সময় ছোটদের মন না বুঝেই আমাদের ইচ্ছাটা তাদের উপর চাপিয়ে দিই। শিশুর সেটা ভাল লাগছে কিনা চিন্তা না ক'রে আমার পছন্দমত তাকে ভাবতে বা চলতে বাধ্য করি। এতে তার মনের স্বাভাবিক বিকাশ কখনও হবে না। পছন্দের বাইরে কাজ করার জন্য শিশুকে যত চাপ দেওয়া যাবে, তত তার বুদ্ধির স্বাভাবিক গতিকেও সংযত করা হবে। বুদ্ধিবৃত্তি তার প্রকৃতিগত সজীবতা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারবে না। তাকে যা' বোঝানো হয় তা-ই সে বুঝতে বাধ্য হয়, যা' করানো হয় তা-ই সে করতে বাধ্য হয়। ভবিষ্যৎ জীবনে এর ফল হয়ে দাঁড়ায় বড় সাংঘাতিক। ঐ শিশু বড় হ'য়ে স্বাধীনভাবে আর কিছু ভাবতে, বলতে বা করতে পারে না। শৈশব থেকে তাকে যে প্রচণ্ডভাবে পরনির্ভরশীল ক'রে তোলা হয়েছে, ঐটাই হ'য়ে দাঁড়ায় তার জীবনের নিয়ামক। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে সে হতচকিত হ'য়ে পড়ে। কাজের সময় অযথা গড়িমসি করা তার চরিত্রগত হ'য়ে দাঁড়ায়। তা' ছাড়া সে দূরদর্শিতা হারায়। ফলে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তার কাছে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে ওঠে।

যে মানুষটি পরবর্তী জীবনে এইসব চারিত্রিক ত্রুটির জন্য কষ্ট পায়, তার জন্য দায়ী কে? দায়ী কি তার ঐ প্রথম জীবনের অভিভাবকবৃন্দ নয়? শিশুর মানসিক সংগঠনের দিকে নজর না দিয়ে তারা যেভাবে তাকে ফলশ্রুতিস্বরূপ সে হয়ে উঠেছে মানুষের দেহে একটা অমানুষ। এইভাবে আমরা বহু

সম্ভাবনাময় জীবনকে অজান্তে ধ্বংস ক'রে দিয়ে থাকি ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যেসব ছেলেমেয়ের অন্যায় কাজের দিকে ঝোঁক থাকে তাদেরও কি সেই পথে বুদ্ধি চালিত করতে দিতে হবে? না, তা' নয় । তাদের ঐ ঝোঁক নিয়ন্ত্রিত ক'রে সৎপথে চলার অভ্যাস চরিত্রগত ক'রে দিতে হবে । কুকাজে যাদের প্রবণতা থাকে তারা তো নির্ব্বোধ নয় । কিন্তু সেই বুদ্ধি তাদের নিজেদেরও ক্ষতি করে, পরিবেশও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অনভিজ্ঞ ছেলেমানুষ তা' বোঝে না । সে তার আপনি খেয়ালে যা' করার তাই করে । এইখানেই এসে পড়ছে তার পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দের শিশুকে সংশোধন করার সুকঠিন দায়িত্ব ।

ছেলেমেয়ে অন্যায় না করুক এটা সব অভিভাবকই চান । কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে সৎপথে আনার কৌশল অনেকেই অবগত নন । তাই, অন্যায় থেকে ঝোঁক ফেরাতে না পেরে অনেকে ছেলেমেয়েদের খুব মারধোর করেন । তারা ভাবেন 'মারের চোটে ভূত পালায়', আর এ দুষ্টবুদ্ধি যাবে না? মারের চোটে ভূত পালালেও পালাতে পারে, দুর্ব্বুদ্ধি কিন্তু অধিকতর শিকড় গেড়ে বসে । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা সোজা পথ পরিত্যাগ ক'রে বাঁকা পথ ধরে । পাদপ্রদীপের আলোকে না এসে তা' বেছে নেয় অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ । এইভাবে পিটুনি দিয়ে শাসন করাটা ছেলেমেয়ের দুর্ভাগ্যের পথই প্রশস্ত ক'রে দেয় । আবার, এই বেদম মার বা পিলে-চমকানো ধমক অনেক শিশুর অন্তরের খোলামেলা ভাবটাকে স্তব্ধ বা নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয় । ফলে, কিছুতেই তার অন্তরের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ সংসাধিত হয় না । কোন-কোন ক্ষেত্রে তার বোধি এমন আটকে যায় যে, সে আটক বাধা আর সরতে চায় না ।

অনেক ছেলেপেলের হয়তো পড়ায় মন বসে না । মন বসাবার জন্য অভিভাবকরা চেষ্টা ক'রে-ক'রে নাজেহাল হ'য়ে শেষে বাচ্চাদের উত্তম-মধ্যম প্রহার করেন । কিন্তু মনটা যে ছেলের কেন বসছে না সেদিকে আমরা ক'জন নজর দিয়ে থাকি? কোন বিশেষ পাঠ হয়তো শিশু বুঝতে পারছে না । এই না বোঝার গাটটা তার কেন তা' কি আবিষ্কার করার চেষ্টা ক'রে থাকি আমরা? বরং কেন বুঝবে না মনে ক'রে ঐ অসহায় মনটির উপর হামলা চালাই । তার মন দিয়ে তাকে বিচার করি না, বিচার করি আমাদের মনের সামিল ক'রে নিয়ে । তা কি হয়? আমরা বুঝতেই চেষ্টা করি না যে, ঐ জ্ঞাতব্য বিষয়ে শিশুর আগ্রহেরই সৃষ্টি হয়নি, তাই তার অনীহা । যদি আগ্রহের সৃষ্টি করে বিষয়টাকে তার কাছে আকর্ষণীয় ক'রে দেওয়া যায়, তখন দেখা যাবে, ঐ কঠিন বিষয়টিই তার কাছে জলের মত সরল হয়ে উঠেছে । কিন্তু এই পদ্ধতিতে সরল করার বুদ্ধি না ক'রে পিটুনি চালাতে থাকলে ঐখানেই শিশুর বুদ্ধি গাঁট বেঁধে যাবে ।

সেই গাঁট আর সহজে খোলা যায় না । তাই দেখে আমরা বলে বসি, ছেলেটির অঙ্কে মাথা নেই বা ইংরাজীতে খুব কাঁচা বা ধড়ে একেবারে ঘোরানো-ফেরানো বুদ্ধি নেই, ইত্যাদি ।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে ছেলেপেলের মেধা নির্ভর করে বিষয়বস্তুতে অন্তরাস (ইন্টারেস্ট) এবং পিতামাতায় ভক্তি বা টানের উপর । এই দুটি বিষয়কে অগ্রাহ্য করা হ'লে প্রায়শঃই ছেলেপেলের বোধবিবেচনার দুয়ার খুলতে চায় না । পিতামাতার উপর টান বা ভালবাসা শিশুর জন্মকাল থেকেই সূক্ষ্ম লতার মত গজিয়ে উঠতে থাকে । ঐটাকে আশ্রয় ক'রেই তার যা কিছু বোধি বা মেধার বিকাশ হয় । কোনভাবে তার মূল ছিন্ন হ'য়ে পড়লে শিশুর মনের গতিও তার স্থির থাকে না, অনেকক্ষেত্রেই তা' লাইন ছেড়ে বেলাইনে ধাওয়া করে । এইভাবে একটি স্বভাবসুন্দর প্রাণ হ'য়ে পড়ে বিক্ষোভজর্জরিত ।

সেইজন্য শিশুশিক্ষার প্রথম পর্য্যায় শুরু হয় ঘরের মধ্যে, তার নিকটতম পরিবেশে । সেখানে মা সন্তানকে বাবার প্রতি আনত করে দেবেন, হাতেকলমে বাবার সেবা করতে শেখাবেন । আবার বাবাও তাকে শেখাবেন মায়ের জন্য ভাবতে ও করতে । এই চর্য্যাসেবার অনুশীলনই সন্তানের জীবন সুস্থ, স্বস্থ, সন্ধিৎসাপরায়ণ ও কল্যাণদীপ্ত ক'রে গড়ে তুলতে সাহায্য করে ।

অনেক পরিবারে শিশুদের কচিবয়স থেকে মুখে-মুখে ইংরাজী, বাংলা বা সংস্কৃত আবৃত্তি শেখানো হয় । যেসব শিশু তাদের পূর্ব্বজন্মের শুভ সংস্কারের বসে ওগুলি টক করে ধরে নিতে পারে এবং নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করে তাদের তো ভালই হয় । কিন্তু এমনটাও ঘটে থাকে যে পাশের বাড়ীর খোকার সুন্দর আবৃত্তি শুনে আমি আমার খোকাকেও ঐ-রকম বড়-বড় আবৃত্তি শেখাতে চাই । কিন্তু সবাই সমান যোগ্যতা ও শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না । আমার খোকার হয়তো তেমন আবৃত্তির বা উচ্চারণের শক্তি নেই । এদিকে পাশের বাড়ীর খোকার তুলনায় আমার খোকা কমতি হয়ে যাবে তা' আমি সহ্য করতে পারি না । অতএব, জোর ক'রে ব'কে বা মেরে ছেলেকে আবৃত্তি শেখাতে লেগে যাই । চোখের

জল ফেলতে-ফেলতে আমার খোকা কোনরকমে টিয়াপাখীর বুলি শেখার মত বুলি শেখে । অথচ এটা তার সত্তাগত হয়নি ব'লে কথাগুলি স্বাভাবিক হয় না । বাড়ীতে যখন কোন বিশেষ অতিথি বা আত্মীয় আসেন তখন তার সামনে দেখাতে চাই, আমার খোকাও কী সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে । খোকা বাবার ধমক খাওয়ার ভয়ে আবৃত্তি করতেও যায় । কিন্তু তার কাছেও জিনিসটা সহজ সাবলীল না হওয়ার জন্য সে কুঁথতে থাকে । কথা বার-বার বেধেও যায় । আর, যত বেধে যায়, তত তার লজ্জা হয় । ভেতরে-ভেতরে সে কুঁচকে যেতে থাকে, মুষড়ে পড়ে । একে অতিথির সামনে ঠিকমত বলতে না পারার লজ্জা, পরে আবার বাবার গালাগালির ভয় । এই দুটি পাশ তার অন্তরের স্নিগ্ধ সজীব ভাবকে পিষে মারতে থাকে । তারপর যখন সে বয়ঃসন্ধি অতিক্রম করে, গায়ে একটু তাগাদ হয়, তখনই সে হয়ে দাঁড়ায় বন্য গোয়ার প্রকৃতির । বাবাকে মান্য করা তার পক্ষে হয়ে ওঠে অসম্ভব । এমন-কি, অন্যান্য গুরুজনের প্রতিও তার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় ।

এখন বিচার করলেই বোঝা যাবে, ছেলেটিকে ঐরকম প্রকৃতির ক'রে গড়ে দেবার মূলে কে বা কারা? আর, এইরকমটা শুধু আবৃত্তির ক্ষেত্রেই নয় । শরীরচর্চা, লেখাপড়া, হাটবাজার করা, বাড়ীর কাজ করা, সবক্ষেত্রেই এই অবাঞ্ছিত ক্রিয়া ঘটে । তার ফলে, সমাজে আর আমরা ভাল মানুষ পাই না ।

মানুষ কাজ করে তার সুরতসম্বেগ দিয়ে । সুরতসম্বেগ যার যত শক্তিশালী, একমুখী ও নিরবচ্ছিন্ন, সে তত বড় কর্মঠ, বীর । তার মনের জোর তত বেশী, বিপদে সে ঘাবড়ায় তত কম । উপস্থিত বুদ্ধি তার হয় প্রখর । বিরুদ্ধ পরিস্থিতি বিনায়িত ক'রে নিজের সুবিধাজনক ক'রে তুলতে সে হয় পটু ।

এই সুরতসম্বেগ হ'ল সত্তার আদিম ঝোঁক । এটা বাইরের থেকে আসে না । প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের সত্তার অন্তরস্থ সম্পদ এই সুরতসম্বেগ । সন্তানের জীবন এই সম্বেগ-দীপ্ত ক'রে তোলার উৎস তার পিতামাতার মধ্যেই নিহিত । পিতামাতার পরস্পর আকৃতিপুষ্ট মিলিত জীবনের ফলশ্রুতি ঐ সন্তান । স্বামী-স্ত্রীর জীবনে সেই আকৃতি তথা পারস্পরিক প্রীতি যত পরিচ্ছন্ন ও ঘনসংবদ্ধ, সন্তানের জীবনও তত সম্বেগদীপ্ত ও কল্যাণকুশল । পরিস্থিতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার শক্তিও সেই জাতকের তত বেশী হয়ে থাকে । কালের শ্রোতে ভেসে যেয়ে সে নিজের জীবনের পাতিত্য ঘটায় না । বিপরীতক্রমে, যে স্বামী-স্ত্রীর জীবন যত ফাঁকে ভরা, অর্থাৎ একজন অন্যজনের দ্বারা আপূরিত হয় যত কম, একের প্রতি অপরের মনে অবিশ্বাস ও অপছন্দ যত ধূমায়িত হ'য়ে উঠতে থাকে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধা ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর টান, এর অভাব যেখানে যত বেশী, সেখানে সন্তানের জীবন হয় তত ম্রিয়মাণ, বোবাবুদ্ধিসম্পন্ন, শ্রদ্ধা-হারা, স্বল্পায়ু, রোগসমাকুল এবং ব্যর্থতায় ভরা ।

আহ্বান

ইষ্টপ্রাণেষু দাদা/ মা

রা-নন্দিত জয়গুরু । প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবারিত করুণায় পরমতীর্থধামে প্রতিদিনই বহু তীর্থযাত্রীর শুভাগমন ঘটে । এছাড়া আশ্রমে নিয়মিত ভক্তবৃন্দ এবং অবস্থানরত ছাত্রগণের দৈনন্দিন আনন্দবাজারের ব্যয় সংকুলানের ব্যাপারটি বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে সারাদেশে অবস্থিত ইষ্টপ্রাণ সুযোগ্য ভক্তবৃন্দের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু দায়িত্বগ্রহণ করতে পারেন । বছরের প্রতিদিনই অর্থাৎ ৩৬৫ দিনই জনপ্রতি ১দিন কেন্দ্রীয় আশ্রমে আনন্দবাজারের প্রসাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংযোগ করলে আশ্রমের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটবে এবং দায়িত্ব গ্রহণকারীর প্রতিও পরমপিতার কল্যাণ অবারিত বর্ষিত হবে ।

তাঁর এই করুণাধারায় মিলিত হবার জন্য সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি ।

বিনয়াবনত–

সভাপতি
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

সাধারণ সম্পাদক
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

বাক্-বিভায় বার্ত্তিক বিগ্রহ ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর

প্রলয় মজুমদার

পার্থিব জগত আর জীবনে, সমস্যা সম্পন্ন আর বিভিন্ন বিকৃতি বিপন্ন বর্ণনা ঠাকুর প্রায় প্রতিদিনই শুনতেন। ঠাকুরের ভিতরে একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। তিনি কিন্তু কোন বিষয়কেই কোন কিছুর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতেন না। প্রত্যেকটা বিষয় থেকেই একটা অচ্ছেদ্য কার্যকারণ সূত্র সঙ্গতির সমাধানের সম্ভাব্য পথ নির্দেশ করতেন।

মানুষের সংকটের জিজ্ঞাসার জবাবে, অথবা নানারকমের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যে সব প্রশ্ন, তারই উত্তর হয়ে, ঠাকুরের ভিতর থেকে ঝর্ণার মতো নেমে আসতো, তাকে 'আগমবাণী" বলা যায়। যার কোনও আগাম বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্ক প্রসূত প্রস্তুতি কিছুই ছিল না। অথচ, বুদ্ধি-বিজ্ঞান, ধী-মেধায়, সাধারণ স্বাভাবিক জাগতিক জীবনে অভূতপূর্ব যেমন, ঠিক তেমনি যেন অচিন্ত্যনীয় ও অলৌকিক বলেই মনে হোত, যেহেতু সাধারণতঃ লৌকিক জীবনে সচরাচর দেখা যায় না বলেই। ঠাকুরের জীবন থেকে এমন প্রবহমান ও বাণীর প্রবাহ প্রায় চব্বিশ হাজার। মানুষের প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসার জবাবে আলোচনা আকর গ্রন্থ তা প্রায় আনুমানিক সাঁইত্রিশ থেকে চল্লিশের খণ্ডের মতো হবে। এছাড়াও, ঠাকুরের বিভিন্ন ভক্তজন লীলা পরিকরের স্মৃতি মথিত আলোকিত জীবনের আলোচনা ছড়ানো। সব কিছু মিলিয়ে ছড়ায় ছন্দে, অনবদ্য ছান্দসিক অস্তিত্বের বাক-বিভায় বার্ত্তিক বিগ্রহের ব্যক্তিত্বেরই বিকশিত ও সম্যক ভাবে প্রকাশিত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। ঠাকুরের পার্থিব লীলায়িত মানুষী জীবনে একটা অপূর্ব অনুপম বিষয় দেখেছি তিনি তাঁর ভাষাতে যে সব শব্দ প্রয়োগ করতেন, তা কিন্তু সবসময়েই সেই সব শব্দের ধাতুগত অর্থের উপর ভিত্তি করে। ঠাকুর মনে করেন যে মার্মিক ব্যঞ্জনা, তা বাস করে সেই ধাতুর ভিতরেই। আবার লক্ষ্য করেছি, সেই শব্দের ধাতুর হয়তো একাধিক অর্থবহ ব্যঞ্জনা আছে, ঠাকুর কিন্তু সব সময়েই তার থেকে সত্তাপোষণী অস্তিবৃদ্ধি সহায়ক অর্থকেই যেমন গ্রহণ করতেন, তেমন ভাবেই সেই শব্দ বাক্য গঠন নির্মাণ আর প্রয়োগ করতেন।

পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাজ্ঞবৃন্দের লেখাতে ব্যবহৃত ও প্রয়োগ করা শব্দের জন্য নিজস্ব অভিধান আলোচনার আয়োজন হলেও, প্রাচ্যে তার প্রচলন নেই বললেই চলে। পাশ্চাত্যে হোমার, পিন্ডার, এসস্কাইলাস, সফোক্লেস, এ্যারিদেষ্টাফানেস, হেরোডেরাস ও থুসিডিদের প্রভৃতি অনেকের ব্যবহৃত শব্দ সংকলন যেমন হয়েছে, তেমনি হোমারের ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ বিধিও দেখানো হয়েছে অভিধানে।

প্রাচ্যে বাংলায় অভিধান প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ সনে। কিন্তু সংস্কৃতে প্রয়োগ অবশ্য অনেক আগেই পাওয়া যায়। সম্ভবত বলা যেতে পারে যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তার ব্যবহৃত শব্দের জন্য প্রাচ্যে প্রথম অভিধান আলোচন প্রবর্তন করলেন। জানতে হলে অভিধানের আশ্রয় নিতেই হয় তা না হলে সেই শব্দের সঠিক অর্থ যেমন জানা যায় না, তেমনি তার বিকৃত অর্থ তার ভাবই সেই শব্দের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে। এই কারণেই ঠাকুরের বাণীতে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করে বলেছেন,–

"শব্দের ব্যবহার বিপর্য্যয়ে
তা'র অর্থকে
বিকৃত করে তুলতে যেও না,
পরিণাম হবে–
উত্তর কালে ঐ শব্দের অর্থ
বিকৃত চলনে চলতেই থাকবে,
বোধও হবে তদানুপাতিক
শিক্ষা বিধায়না বাণী – ১১৪

শব্দ ও ভাষার সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যানুগ প্রয়োগ অভ্যাস কিন্তু জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় চারিত্র্য উৎকর্ষতায় সমুত্থত করে তোলার এক সহায়ক শক্তি বিশেষ। যেমন বলা যেতে পারে, কোন পরিবারে, সব সময়ে সব কথায় যদি অসত্য অমার্জিত আর অশালীন শব্দ ও ভাষার ব্যবহার হয়, সেই পরিবারের ব্যক্তিদের, চিন্তন, মনন, বাক্য-ব্যবহার, আচরণ কর্মের সঙ্গে, আর যে পরিবারে এমন ভাষা আর শব্দের প্রচলন হয় না, সেই পরিবারের সাংস্কৃতিক কোনরকম পার্থক্যই থাকবে না?

ঠাকুর কোন ঘটনাকেই বিচ্ছিন্ন করে ভাবতেন না। জগত আর জীবনের যা কিছু, সর্বপ্রথম জৈব পরিকাঠামোয় ধরা পড়ে, ব্যাখ্যাত হয়, সর্ব জৈব সংস্থিতি অনুযায়ীই। গ্রহণ ও ধারণও সেই মতোই। বুদ্ধিও সেই মতোই সক্রিয় থাকে। সেই কারণেই ঠাকুর তাঁর বাণীতে সতর্কতায় সাবধান করে জানালেন,

জন্মগত জৈবী-সংস্থিতি
যেমনতর সুষ্ঠু ও পুষ্ট–
সক্রিয়তা, ধারণ ক্ষমতা,
বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিও হয়ে ওঠে তেমনতর।

–শিক্ষা বিধায়না বাণী–১৬৩ ।

জৈব-সংস্থিতি যেখানে সুষ্ঠু
বোধি প্রাণতা ও বিদ্যাও
সেখানে প্রাঞ্জল,
সার্থক সামঞ্জস ।
বাণীসংখ্যা– ১৬২ শিক্ষা বিধায়না

শব্দ আর ভাষার সঠিকসম্যক অনুশীলনযোগ্য অভ্যাস আর প্রয়োগ এবং ব্যবহার জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে কতোখানি প্রয়োজনীয় আর অপরিহার্য্য তা বোধ করতে পারা যায়, বর্তমানের সময়ের শরীরে রাজনীতিকবৃন্দের ব্যবহৃত ভাষা আর শব্দ ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে, আজ যা আলোড়িত ও আন্দোলিত হতে হতে আদালতের আঙ্গিনায় বিচারের অপেক্ষায় ।

ঠাকুরকে দেখেছি যে, তাঁর সামনে যখন যেমন জিজ্ঞাসা প্রশ্ন আর বিষয় আলোচিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সংঘাতে যেন, ঠাকুরের ভিতর থেকে নেমে এসেছে সেই আগমবাণী । তিনি এইরকমের পরিস্থিতিতেই বলেছেন –

ধারণার বোধ-বিদীপ্তি
আনে শব্দ,
ঐ শব্দ উৎসারিত হয় স্বরে,
আর, ঐ স্বরবিন্যাসই আনে বাক্,
আর, বাকের অর্থই হচ্ছে–
সঙ্গতিশীল ধারণা-তাৎপর্য্য,
যা' তৎ-সংক্রিয় হয়ে
ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে ।
শিক্ষা বিধায়না বাণীসংখ্যা -১১৫

সাধারণত মানুষের চলমান জীবনে মানুষ, শব্দ আর ভাষার প্রয়োগ আর ব্যবহার অতশত ভাবে না । অথচ, সামান্য ভুল প্রয়োগে কী বিরাট ক্ষতির মুখোমুখিই যে মানুষকে হতে হয় তার ইয়ত্তা নেই । ঠাকুর তাঁর ছড়ার বাণীতে সেইজন্য বারে বারে সাবধান করে বলেছেন, " এক লহমার বেফাঁস কথা / চিন্তাচলন আলোচনা / ছোটেই নিয়ে পিছু পিছু দূরদৃষ্টির কী লাঞ্ছনা ।" –অনুশ্রুতি

দূরদৃষ্টির এই লাঞ্ছনার পরিবেশ সামনে এলেই কিন্তু মানুষ বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে । মানুষের জীবনে এমন বিষাদ যোগ লেগেই আছে– কম বেশী । ঠাকুরের অচ্ছেদ্য যে মানুষীলীলামাহাত্ম্য, সেখানে যেন তিনি, নব নব রূপে বিগত সমস্ত মহামানবকে পরিপূরণ করে যুগানুযায়ী যুগন্ধর যুগবার্তাকে প্রবর্তন করেছেন, আচার্য্য নিদেশী অনুশীলনী অভ্যাস যোগের মাধ্যমে ।

প্রসঙ্গত আমরা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ের একটি শ্লোকের একটা মাত্র 'শব্দ' কে ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ করবো–

'কৃপয়া পরয়াবিষ্ঠো বিষীদন্নিদম ব্রবীৎ॥ ২৭ এখানে অর্জ্জুনের কী হলো ?'বিষাদন্'– তিনি বিষাদযুক্ত হয়ে বলতে লাগলেন– 'বিষাদন্নিদম ব্রবীৎ' । এই যে বিষাদের পটভূমিকা মানুষের জীবনে নানা রকমারি পরিবেশ পরিস্থিতিতে আসে । এসময় যখন জীবনে ছেয়ে আসে তখনই কিন্তু মানুষের জীবনে জাগে জিজ্ঞাসা ।

যে জিজ্ঞাসা আলোর জিজ্ঞাসা! পারমার্থের জিজ্ঞাসার কারণেই সাধু মহাজন সুধী বৃন্দ বলেছেন যে, বিষাদ মানুষের জীবনে এক পরম সৌভাগ্য । তাই তো উপনিষদের ঋষি বলেছেন, – "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত!"

ঠাকুর বলেছেন তার সত্যানুসরণে" জেগে ওঠার আকুতি আসে কখন? যখন, 'অভাবে পরিশ্রান্ত মন'– বিপথ হয় । অবসাদ বিষাদে জর্জরিত হয় । আর, জেগে ওঠার লক্ষণ কী? নানা সংকটের ভিতরে শ্রেয় পথ কী? তা তো তেমনতর 'শ্রেয়র কাছেই জিজ্ঞাসা করতে হয় । তাই তো শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভিতরে অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা, "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তস্মে"অর্জ্জুনের ভিতরে কেউ জেগে ওঠার দ্বিতীয় লক্ষণরূপে আমরা পেলাম । তিনি শ্রেয় চরণে প্রণাম নিবেদন করে জানাচ্ছেন, 'নিশ্চিতং ব্রুহিঃ'– অভ্রান্তভাবে আমাকে শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করে দাও ।

প্রাথমিক আলোচনাতেও ঠাকুর যেন সেই পথে শ্রেয় পথ নির্দেশ করে বলছেন,

জীবন-যাপনের পক্ষে
প্রাত্যহিক ও প্রায়শঃ প্রয়োজনীয় যা',
যাই কর, আর তাই কর,
সেইগুলির প্রস্তুত–প্রণালীকে
আগে এস্তামাল করে ফেল– সপরিজন,
যা'তে তা'র জন্য
অন্যের মুখাপেক্ষী না হতে হয় প্রায়শঃ,
তারপরে আর যা' করবার তা' কর;
এর অভবে
মানুষের অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়,
আর, অন্যায্যভাবে
অন্যের মুখাপেক্ষী হ'তে হয়,
যার ফলে
জীবন-চলনা ব্যাবহতই হয় অনেক ক্ষেত্রে
আর, দুঃখ ও ক্ষোভের উৎপত্তি হয় ।
বাণী সংখ্যা–৮৩ শিক্ষা বিধায়না

জীবনের কতো সাধারণ ছোট ছোট বিষয়কে ঠাকুর তাঁর বাণীতে বলেছেন। কারণ, ঠাকুর বিশ্বাস করেন যে, ধর্ম করলে সাধারণ জ্ঞান আসে। সঙ্গে সঙ্গে হয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর তার ক্রমাগতি।

সমাজের অসাধারণ সব অস্তিত্বের ভিতর দিয়ে যে সব শব্দ আর ভাষার আমদানি, চলাচল আজ যে ভাবে, সাধারণ সব ধারণাকে নষ্ট শুধু নয়, বিকৃতও করে তুলছে তার অন্তর্নিহিত ভাব আর বোধ, যার থেকে শব্দ যেমন অর্থ চারিত্র্য হারাচ্ছে, তেমনি অর্থও অবসন্ন হয়ে চলেছে। ঠাকুরের কাছে থেকে দেখেছি যে, কথা বলারও যেন কেমন একটা অপূর্বসত্তাপোষণী শৈলী আছে। কথা বলতে গেলে, একই সঙ্গে যেন সেই কথা ব্যক্তিগত-সমষ্টিগত আর বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। ঠাকুরের বাণীপ্রবাহে যেন সেই চিন্তন আর মননশীলতাকে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা আর শব্দকে আশ্রয় করে হলেও, ঠাকুরের বাণীপ্রবাহে যেন সেইবিশ্বজনীন বার্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় বলেই তো, তিনি আজ সেই পরমপ্রেমময় বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্বের বিগ্রহেই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত।

শব্দ-তাৎপর্য্যকে ম্লান হ'তে দিও না,
শ্রদ্ধানুগ বাক্যে,
ব্যবহারে, আচারে
শব্দ-নির্দেশিত বস্তুর প্রতি
শব্দ তাৎপর্য্য-আনুপাতিক
বিহিত ব্যবহার কা'রো
যথাযোগ্যভাবে;
নয়তো বাক্য নির্দেশিত বস্তুর ধারণাও
ক্রমশঃই খিন্ন হ'য়ে উঠবে
কৃষ্টিবোধনাও
সাথে-সাথে অবসন্ন হয়ে চলবে
ভেবে, তাৎপর্য্যে নজর রেখে
বিহিত যা' তাই করো॥

–শিক্ষা বিধায়না বাণীসংখ্যা – ১২৭

ঠাকুর শব্দ থেকে শুধু তার ধাতুগত অর্থকেই গ্রহণ করেননি, বরং তার আগমবাণীতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেখানে ব্যাকরণ তার বিধিবদ্ধ সংজ্ঞাতেও যেন বিধৃত হয়ে আছে–

বোধদ্দীপনা
ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
যেমনতর ভাষার সৃষ্টি করে–
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে–
তাই কিন্তু বুৎপত্তি
বা ধাতুর পরিচিতি;
আর, ধাতু মানেই
যা' অর্থকে ধারণ করে
ঐ ধাতুই শব্দের উৎস,
আর উপসর্গই
ধাতুর্থকে বিশেষিত ক'রে থাকে,
আর, প্রত্যয় তাই–
যা' অর্থকে নিশ্চয় ক'রে দেয়।

–শিক্ষা বিধায়না বাণীসংখ্যা - ১২২

ঠাকুর বাংলা ভাষাকে শুধু সমৃদ্ধই করেননি, তিনি যেন সাধনার সংজ্ঞাকেও নির্দেশ করেছেন। অজ্ঞতা থেকে ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের যে বিকৃতি, আজ অনেক শব্দেরই এমন রূপ আর চেহারা তৈরী করেছে, যাতে সেইসব শব্দ যেন অনেকটা অজ্ঞাতকুলশীল অবয়বে বিকৃত অর্থেরই ধারক ও বাহক। বাংলা ভাষা আর শব্দের প্রতি ঠাকুরের যে টান আর প্রাণ, যে ভালোবাসা আর নিষ্ঠা, তাকে যেন মনে হয়, ভাষা আর শব্দকে তিনি যেন জীবন্ত চলন্ত মানুষের মতো বোধ করেই বাণী দিলেন,

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অবমাননা
যেমন অপরাধ,–
ভাষা ও শব্দের তাৎপর্য্যের অপলাপও
তেমনি গর্হিত,
কারণ, ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে অবদলিত করলে
তা, যেমন খাটো হয়ে যায়,–
যার ফলে, নিজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য
প্রতিক্রিয়ায় তেমনি হ'য়ে দাঁড়ায়,–
ভাষা ও শব্দের তাৎপর্য্যকে অবদলিত ক'রে,
কুৎসিৎ অর্থে ব্যবহার করলে–
ঐ ভাষাগত বোধের সঞ্চারও
তেমনি অবদলিত হয়ে ওঠে।

–শিক্ষা বিধায়না বাণীসংখ্যা-১২৩

শব্দ আর ধাতু থেকে তার অর্থের আহরণ সম্পর্কে ঠাকুরের সহজ ছড়ার বাণী,

"যেমন যাই না থাক
শব্দের অর্থ ব্যবহার,
ধাতু তাৎপর্য্যে মিলিয়ে তা'রে
করিস অর্থে সমাহার,
সার্থকতা পাবি যেথায়
সেইটেই হল অর্থ আসল
অন্য কিছু সবই বাজে
ফলবে না তায় কোন ফসল।

(অনুশ্রুতি/৪র্থ/ শিক্ষা/৩৮)

প্রত্যেকশব্দেরই কিন্তু দুটা রূপ আছে । একটা হলো প্রচলিত অর্থ, আর একটা ধাতুগত অর্থের রূপ । ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝবার জন্য সামান্য দু-একটি শব্দ নিয়ে বিষয়টাকে সহজেই অনুভব করা যেতে পারে । ঠাকুর প্রত্যেকটি শব্দকে কেমন ভাবে দেখেছেন, গ্রহণে প্রয়োগ করেছেন, আর, তার আত্যন্তিক মার্মিক ব্যঞ্জনাকে সহজ সাবলীলতায় মানুষের প্রাত্যহিক জীবন চর্য্যার সাথী করে বিকৃতিকে বিশুদ্ধ করে তুলেছেন ।

আর্য্য ভারতীয় শাস্ত্রীয় বিধিতে যেমন উপবীত গ্রহণের নির্দেশ আছে । চলতি বাংলায় যাকে 'পৈতা' বলে সকলেই জানেন ।' উপবীত' এর অনেক ব্যকরণ বিভক্তির ভিতরে ঠাকুর গ্রহণ পূর্বক, 'ই' ধাতু দিয়েও উপবীত হতে পারে । 'ই' ধাতুর মানে, গমন, অধ্যয়ন, স্মরণ । ঠাকুর বললেন, – 'উপ' মানে আচার্য্যের কাছে উপনীত হওয়া, 'বি'- মানে, বিহিত ভাবে, আর, 'ই'- মানে গমন, স্মরণ, অধ্যয়ন; আচার্য্যের কাছে উপনীত হয়ে বিহিত ভাবে চলার যে স্মারক সূত্র পাওয়া যায় তাই উপবীত ।

পুত্র শব্দের নানারকমের ব্যকরণ বিবাদ বিভক্তির ভিতর থেকে ঠাকুর মনিয়র উইলিয়ামস–এর বহু উদাহরণের অনুমানের যে আলোচনা, তাকেই গ্রহণ করেছেন । 'পুষ্য'– ধাতু থেকেও পুত্র শব্দ গঠিত হওয়া সম্ভব । 'পুষ' মানে, পোষণ, ধারণ । ঠাকুর বললেন, "পুত্রের কর্তব্য কী? 'পুত্র'– নাম কেন, এবার তা বোঝা যায় । পিতৃকৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে পোষণ দিয়ে যে বাড়িয়ে নিয়ে যায় । সেই পুত্র ।"

প্রতিদিন প্রচুর মানুষ আসতেন ঠাকুরের কাছে নানা রকমের ইচ্ছা নিয়েই । এমনই একজন ঠাকুরের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করাতেই, ঠাকুর অভিধান আলোচনা করে দেখলেন,–" 'অনু'- মানে পশ্চাতে, অনুসরণ পূর্বক, আর 'গ্রহ'- মানে গ্রহণ । শব্দের অর্থকে জেনে ও জানিয়ে ঠাকুর বললেন, 'অনুগ্রহ তো শালা এমনি হ্যাটে হ্যাটে আসে না, গ্রহণ করে ঠিক মতো অনুকরণ করে চললি পর অনুগ্রহ লাভ করা যাবের পারে ।" ঠিক এমনি 'ঊর্ব্বশী' শব্দ সম্পর্কে, আমাদের প্রচলিত অর্থের রূপ বোধ আর একটা প্রচলিত নিজস্ব ধারণা আছে । ঠাকুরের কাছে দেখেছি । তিনি কেমন করে তার বিকৃত অর্থের বিশুদ্ধকরণের মধ্যে দিয়ে সেই ধারণার গতিকে ফিরিয়ে দিলেন । অভিধান আলোচনায় জানা গেল, 'উরু'- মানে মহৎ, তারপর 'অশ' ধাতু যোগে উর্ব্বশী হয়েছে । 'আশা'-মানে হলো 'প্রাপ্তি' । আবার মনিয়র উইলিয়ামস এর সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানে 'বশ' ধাতু থেকেও উর্ব্বশী শব্দের উৎপত্তি পাওয়া যায় । 'অশ' মানে প্রাপ্তি এবং 'বশ্' মানে কামনা বা ইচ্ছা করা । ঠাকুর বললেন ঊর্ব্বশী মানে,– "মহৎকে যিনি কামনা করেন, তিনিই ঊর্ব্বশী" ।

ঠাকুর যেমন বাংলা শব্দের ধাতুগত অর্থের উপর ভিত্তি করে নানা রকমের অর্থের থেকে সত্তাপোষণী অস্তিবৃদ্ধি সহায়ক অর্থকে গ্রহণে প্রয়োগ করছেন, ঠিক তেমনি, বহু প্রাচীন অব্যবহৃত বিস্মৃতপ্রায় অনেক শব্দকেও, নতুন করে ফিরিয়ে নিয়ে এসে, সেই শব্দে প্রাণ সঞ্চার করে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তিনি বাংলা ভাষা আর সাহিত্যকে । এই রকমই একটা শব্দ হলো,– 'উর্জ্জা' । শ্রীশ্রীঠাকুর সেই শব্দকে নোতুন করে ফিরিয়ে এনেছেন তার বাণীতে । প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ঋগ্বেদে যার ব্যবহার,– 'তা ন উর্জ্জে দধাতন' । ঠাকুর সেই শব্দকে ব্যবহার করলেন,–'তরঙ্গায়িত উর্জ্জনায়' । আরও একটা শব্দ,– 'অতিসায়নী' । খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাণিনি এই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন,– 'অতিশায়নে তমোবিষ্ঠানৌ' । ঠাকুর অনেক বাণীতে 'অতিশয়নী' শব্দ ব্যবহার করেছেন,– 'সুকেন্দ্রিক অতিশয়নী আলম্বন-তৎপরতায় ।' ঠাকুর এই শব্দের অর্থ করেছেন,– আগ্রহান্বিত ঝোঁক । এই শব্দকে ঠাকুর ব্যবহার করেছেন,– তাঁর বিজ্ঞান বিভূতি, তপোবিধায়না, যাজীসূক্ত, ও আশিস-বাণী' বইতে । বাংলা ভাষায় আর একটা শব্দ,– 'দয়' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়ে নানা রকমারি শাব্দিক আলংকারিক ব্যঞ্জনায় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ঋগ্বেদে আর পাণিনিতে ও যার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় । ভারতের বিভিন্ন ভাষাতেও নানা ভাবে ব্যবহৃত 'দয়' ধাতু থেকে উৎপন্ন, – দয়াবান, দয়ালু, দয়াবান, দয়াল, দয়ালী,– ইত্যাদি নানাভাবেই যার আলংকারিক শাব্দিক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় ।

শ্রীশ্রীঠাকুর 'দয়'- ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দকে সামান্য পরিবর্তন করে প্রয়োগ করলেন তাঁর বাণীতে,– 'দয়ী পুরুষের দয়া ।' একই রকমের মনে হলেও যেন 'দয়ী'- অনেক উন্নত মানের শাব্দিক গঠন আর প্রয়োগ । ঠাকুর এই শব্দ প্রয়োগ করেছেন,– বিজ্ঞানবিভূতি/ সেবা বিধায়না /সমাজ সন্দীপনা /আদর্শ বিনায়ক/আশিস-বাণীতে । বিভিন্ন ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দের সামান্য পরিবর্তন করে, কোথাও সামান্য সংযোজনায় তিনি যেন বাংলা শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন । সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শব্দ– ভাষা আর সাহিত্যকেও যেন ঋদ্ধ করে তুলেছেন এক অনন্য উন্নত সংস্করণের উৎকর্ষতাতেও ।

সময়ের প্রবহমানতায় যুগে কালে পরিস্থিতি আর পরিবেশের সংঘাতে ভাষা তার শব্দের পরিবর্তন করে ফেলে । এরকম অনেক পরিবর্তিত অর্থের ভিতরে যেমন 'দেশ' আর 'বলি' দুটো শব্দ বলা যেতে পারে । সেই কারণেই ঠাকুর তাঁর

বাণীতে জানালেন,–
ভাষা
বিভাবিত ও বিন্যাসিত হয়ে থাকে–
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
সংঘাত– সংযোজনী
তাৎপর্য্যের ভিতর দিয়ে ।
–শিক্ষা বিধায়না বাণীসংখ্যা - ১১৭

'দেশ'– শব্দ এসেছে 'দিস' ধাতু থেকে, যার অর্থ হলো, আদেশ করা । ঠাকুর জানালেন, 'এক আদেশের অনুকরণে অনুশীলনী অভ্যাস চর্যায় চললেই তো তাকে দেশ বলা যেতে পারে । 'বলি' এসেছে 'বল' ধাতু থেকে । মানে, জীবন, বেষ্টন, সমৃদ্ধি, দান । ঠাকুর বললেন,– 'যা জীবনকে বেষ্টন করে বর্ধিত হয়ে উঠে উচ্চতর আদর্শে সম্যক প্রকারে জীবনকে দান করতে আত্মোৎসর্গীকৃত করে তোলে, – তাকেই তো 'বলি' বলা যেতে পারে । আবার, পরবর্তীকালে বল ধাতুতে আরও দুটি অর্থের সংযোজনা পাওয়া গেছে, তা হলো– হিংসা ও বধ । এই নবতম অর্থ সম্পর্কে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তার বাণীরই মূর্ত বিগ্রহ স্বরূপ বাক বিভায় প্রকাশ করে বললেন,– "জীবন সমৃদ্ধির হানিকর যা, তার প্রতি হিংসা, তাকে বধ করা ।
এই হলো হিংসা ও বধের তাৎপর্য্য ।"
সেইকারণেই অভিধান আলোচন তাৎপর্যপূর্ণ
ও অপরিহার্য্য বলেই সেই অভিধানের প্রাসঙ্গিকতা
সম্পর্কে ঠাকুর বললেন,
শব্দের অভিধান করতে গেলে–
প্রত্যেকটি শব্দ যা'তে
বিহিতভাবে বিধৃত হয়,
ধারণায় আসে,–
তা' উৎস হতে ব্যবহার পর্য্যন্ত
যা-যেখানে যেমনতর হয়ে থাকে–
তা' করো–
বোধায়নী তাৎপর্য্যে,
ব্যতিক্রমদুষ্টির স্থান যা'তে না থাকে–
নজর রেখো,
ব্যতিক্রমের মরীচিকা
আসল রূপকে আবৃত ক'রে,
তা'র নকল প্রতিফলনই দেখিয়ে দেয় কিন্তু ।
– শিক্ষা বিধায়না বাণীসংখ্যা – ২৩৮

আর্য্য ভারতবর্ষের শ্রীমদ্‌ভগবদ্ তো সেই কারণেই সকলকেই জানিয়েছেন যে, 'মহাপুরুষ; অর্ভ্যঢ্যঃ'– মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করো । কারণ, বাস্তব মত্র বস্তু শিবদম্' । সাক্ষাৎ উপলব্ধি থেকেই তো উত্তাপ সংগ্রহ করতে হয় । ভাগবৎ, তাই কী বললেন,– 'মহৎ সেবাং দারমাহুর্বিমুক্তেঃ' । জীবনে তো বিমুক্তির একটাই পথ । মহতের সঙ্গ । সেখানেই আসে,– 'পশ্যতিবস্তু সূক্ষ্মম' আর তা হলেই তা সমস্ত রকমের দূষণ দূরীভূত হয় । ফলে, সেখানেই আসে,–'হৃদ্যন্তস্থো হি অভদ্রানি বিধুনোতি' । সমস্ত জগতটা তখন নির্মল হয়ে ভেসে উঠবে ।

সহায়ক গ্রন্থ:-
শিক্ষা বিদায়না - শ্রীশ্রীঠাকুর
নববেদায়ন-দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
শব্দীরত্নকোষ - সৎসঙ্গ পাবলিশিং
গীতার কথা
শ্রীমদ্‌ভাগবৎ কথা - গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়

সন্দীপনায় যে কোন লেখা পাঠাতে এই মেইল নাম্বারগুলোতে পাঠান–
E-mail: tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

মানসতীর্থ পরিক্রমা

সুশীলচন্দ্র বসু

নেতাজী সুভাষ

সুভাষচন্দ্রের পিতা-মাতা শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, কাজেই তাঁদের নিজ বাটিতেই সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, ডাঃ সুনীল বসু, সতীশচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল । দেশবন্ধুর বাড়িতে সুভাষচন্দ্রের সাথে পরিচয় আরও গভীরভাবে হবার সুযোগ মেলে । সে সময়ে আমার মনে আছে, সুভাষচন্দ্র আমাকে বলেছিলেন–"ছেলেবেলা থেকেই আমার ধর্ম্মের প্রতি গভীর টান ছিল । যেভাবেই হোক, রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে পড়েছি, মনে ভেবেছি আর কোনও দিকে না গিয়ে, জীবনটা এভাবেই বলি দেব ।"

সুভাষচন্দ্র I.C.S. পাশ করার পর চাকুরী না ক'রে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েই ভারতে ফিরলেন । দেশে ফিরবার কয়েকদিন পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য তাঁর মামা, ব্যারিষ্টার জে. এন. দত্তর সঙ্গে বাগবাজার কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীটে দুর্গামাসীমার বাড়ীতে আসেন । সে সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর, জননী মনোমোহনী দেবী, অনন্ত, মহারাজ ও আমি দুর্গামাসীমার বাড়িতে ছিলাম । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সেবার influenza সংক্রামক ব্যাধিরূপে দেখা দেয় । তখন এই জ্বরকে war fever বলা হত । এই war fever-এ তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও আমি প্রবলভাবে আক্রান্ত হই । সে সয়ে দুর্গামাসীমা ও বাড়ীর অন্যান্য সকলে আমাদের কিভাবে যে সেবাযত্ন করেছিলেন তা এখন মনে হ'লে তাঁদের প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হই ।

সুভাষচন্দ্র এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে আলাপ করতে এসে ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে ফিরে যান । আমি রোগশয্যায় শুয়ে এই সর্ব্বপ্রথম সুভাষচন্দ্রকে দেখি, সাক্ষাৎভাবে আলাপ করবার সুযোগ তখনও হয়নি ।

এর কয়েক বৎসর পরে তিনি আশ্রম দেখতে হিমাইতপুর আসেন । তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঘুরে-ঘুরে দেখাই ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ম্মধারা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি বহু বিষয়ে আলাপ হয় ।

আশ্রম দেখে তিনি বললেন–সাধারণতঃ আশ্রম বলতে লোকে সন্ন্যাসী বা গৃহত্যাগীদের আশ্রমই বোঝে । গৃহী হ'য়ে পরিবার পরিজন-সহ আশ্রম-জীবন যাপন করবার দৃষ্টান্ত আপনারাই প্রথম দেখাচ্ছেন । পরিবার-পরিজনের ভার ঘাড়ে ক'রে, দৈন্য অভাব অভিযোগের মধ্যে দিয়ে আপনারা এগিয়ে চলেছেন । তাই আমার মনে হয়, আপনারা একটা বড় গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন । আপনারা যদি সত্যি-সত্যি এভাবে আশ্রম গড়ে তুলতে পারেন তাহ'লে আপনারা দেশের কাছে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল হ'য়ে থাকবেন । গৃহী হ'য়েও আশ্রমজীবন যাপন করা যায়, এ কথা লোকের কাছে আর অবিশ্বাস্য বলে বোধ হবে না ।

বিবাহ ও সমাজ-সংস্কারের কথা শুনে বললেন–দেখুন, এ সম্বন্ধে আপনারা যা বলতে চাইছেন তা দৃঢ়কণ্ঠে লোকের সামনে ঘোষণা করুন, তাতে একদল লোক আপনাদের ঘোর বিরোধী হ'য়ে দাঁড়াবে বটে কিন্তু অপর দিকে এমন কতকগুলি সমর্থন করবে । তাদের সাহায্যে আপনাদের কাজ খুব এগিয়ে যাবে । বিরুদ্ধবাদীরা আপনাদের রুখতে পারবে না ।

সমস্ত আশ্রম দেখার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললেন–আমার মা আমাকে একবার আশ্রমটা দেখে যেতে বলেছিলেন, তাই দেখতে এলাম । দেখে বেশ ভালই লাগল, ওনার (লেখকের) সাথে সৎসঙ্গের ভাবধারা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হ'ল । এ সম্বন্ধে আমার মতামত ওনাকে জানিয়েছি ।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে তাঁর বাবা, মা এবং অন্যান্য সবার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, সুভাষচন্দ্র যথাযথ উত্তর দিলেন । তারপর তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন–দেশের তো নানা কাজই করবার আছে । তা দেশের প্রকৃত সেবা করতে হ'লে কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে? এ বিষয়ে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর–আমার কথা হ'চ্ছে, দেশের কাজ করতে হ'লে প্রথমে মানুষ তৈরীর programme নিতে হবে । ভাল মানুষ পেতে হ'লেই বিবাহ-সংস্কার আশু প্রয়োজন । আর এটা এমন ভাবে করতে হবে যাতে সব বিয়েগুলিই compatible (সুসঙ্গত) হয়; আর Compatible মানেই বিহিত সঙ্গতি । বর্ণ, বংশ, আয়ু, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি সব হিসাব ক'রে দেখে-শুনে কাজ করতে হয় । বিহিত বিবাহ হ'লেই ভাল সন্তানাদি আসে, আর তখন তাদের দ্বারাই দেশের, দশের সবারই কাজ হয় । সেইজন্য মানুষ তৈরীর ব্যবস্থা আগে করা প্রয়োজন । দাশদা যখন আমায় বললেন যে তিনি মানুষ খুঁজে পাচ্ছেন না যার উপর ভার দিয়ে তিনি একটু সরে দাঁড়াতে পারেন,–তার উত্তরে আমি একথাই বলেছি ।

সুভাষচন্দ্র–মানুষ তৈরীর যে আশু প্রয়োজন তা ভেবেছি । কিন্তু তা করতে হ'লে যে বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজন তা ভেবে দেখিনি । বিবেকানন্দও মানুষ তৈরীর কথা বলে গিয়েছেন

কিন্তু কি ক'রে হবে তা তেমন ক'রে বলে যাননি । আমার মনে হয়, তিনি শিক্ষার উপরই জোর দিয়েছেন । কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, ভাল সংস্কার-সম্পন্ন শিশু যদি না জন্মায় শুধু শিক্ষা তাদের বিশেষ কি করতে পারে? বীজ থেকেই তো গাছ হয়, বীজ ভাল হ'লেই গাছ ভাল হবে এটা আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি । কিন্তু এ তো দীর্ঘ সময় স্বাপেক্ষ । শ্রীশ্রীঠাকুর–দীর্ঘ সময় তো নেবেই । আমরা তো এতদিন পর্য্যন্ত জাতির বা সমাজের জন্য কিছুই করিনি । বহু গলদ জমে গেছে । তা সাফ করতে সময় নেবে বৈকি' কোন short-cut programme-এ জাতির সত্যিকার কল্যাণ হবে বলে আমার মনে হয় না ।

আরো নানা কথা হবার পরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রাণাম ক'রে বিদায় নিলেন । যাবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর, সুবিধা হ'লে তাঁকে আবার আসতে বললেন ।

তিনি মাথা নত ক'রে সম্মতি জানালেন ।

সুভাষজননী প্রভাবতী দেবী আমাকে খুব স্নেহ করতেন । তাই কলকাতায় গিয়ে তাঁর সাথে দেখা না করলে তিনি দুঃখ করতেন । সেজন্য কলকাতায় গেলেই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসতাম । সেই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে ও মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পর্কেও অনেক আলোচনা হয়েছে ।

সুভাষজননী একদিন সুভাষের বাল্যকালের কথা বলতে-বলতে আমাকে বললেন–সুভাষের ধরণটা ছোটবেলা থেকেই আমাদের অন্যান্য ছেলেদের চাইতে আলাদা রকমের ছিল । সে আমার কাছেই শয়ন করত । মাঝে-মাঝে রাত্রে উঠে দেখতাম সুভাষ পাশে নেই । একদিন বিছানা থেকে উঠে তার খোঁজে বের হ'য়ে দেখি সে ছাদের উপর হাতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে । তাকে ডেকে বললাম–এরকমভাবে শুয়ে আছিস্ কেন?

সুভাষ বলল– তুমি আমাকে নরম বিছানায় শুইয়ে শরীরটাকে নরম ক'রে দিচ্ছ ।

ভবিষ্যতে এই নরম শরীর দিয়ে আর কোন শক্ত কাজ করতে পারব না, তাই বিছানা থেকে উঠে এরকম ক'রে ছাদের উপর শুয়ে থাকি ।

ছেলের কথা শুনে তো আমি অবাক! বললাম–তোকে আবার কষ্ট করতে হবে কেন?

সুভাষ উত্তর দিল–জীবনে বড় হ'তে গেলে, দেশের কাজ করতে গেলে, শরীর সুদৃঢ় করা দরকার ।

আর একদিন সুভাষজননীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে কথা উঠতে তিনি বললেন–স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথান্তর বা মনান্তর যে কি ক'রে হয় তা আমার জীবনে আমি জানি না ।

তাঁর এই কথা শুনে এখন আমার শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে পড়ে গেল । শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন–স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা থাকলে সন্তানসন্ততি ভাল হয় । এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের জনক-জননীকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সত্যতা যাচাই করা চলে । সুভাষজননী সত্যিই রত্নগর্ভা ।

সুভাষজননী-সম্বন্ধে আর একটি কথা বলতে চাই; একথা তাঁরই মুখে শুনেছিলাম । সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর C.I.D. বিভাগের একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী এসে তাঁকে প্রশ্ন করেন–"সুভাষবাবু অসামান্য মাতৃভক্ত ছিলেন । আপনাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে তিনি কোন কাজেই হাত দিতেন না–আমরা জানি তিনি অন্তর্ধানের পূর্ব্বে আপনাকে নিশ্চয়ই বলে গিয়েছেন যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন । আপনি সেটা অনুগ্রহ ক'রে আমাকে জানিয়ে দেবেন কি?"

সুভাষজননী সেই রাজকর্ম্মচারীটিকে বলেছিলেন–আপনার কথার উত্তর দেবার আগে আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন–আমার এই বাড়ির আশপাশ চারিদিকে গোয়েন্দা দিয়ে আপনারা এমনভাবে ছেয়ে রেখেছেন যে একটা কাক-বকও আপনাদের সতর্ক-দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যেতে পারে না । এ অবস্থায় আমার ছেলে যে আপনাদের সদা জাগ্রত ও সতর্কদৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও চলে যাবে এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য, তাই আমার ছেলেকে আপনারা কোথায় নিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন আগে তার জবাব দিন!

সুভাষচন্দ্র আর একবার আশ্রমে এসেছিলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের বেশ কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্তরীণ অবস্থার ঠিক পূর্ব্বে । সুভাষ তখন জন-নেতা হিসাবে সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, তাই তিনি আশ্রমে আসতে এত অত্যাধিক লোকের সমাগম হ'ল যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎমাত্রই হ'ল, কোন কথা বলবার সুযোগ হ'ল না । তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন–শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করব বলে এসেছিলাম, এত লোকের ভিড়ে তা আর সম্ভব হ'ল না । আমি বললাম–আসুন না, আমি লোক সরিয়ে দিয়ে, যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে privately কথা ব'লতে পারেন তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি । কিন্তু তিনি তা অস্বীকার ক'রে বললেন–এতলোকের অসুবিধা ক'রে তা করতে চাই না ।

এই-ই সুভাষের সাথে শেষবারের মত সাক্ষাৎকার । আশ্রম থেকে কলিকাতায় ফিরে যাবার পরই তিনি অন্তরীণ হন । তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে যে ঘরে তিনি একাকী বন্দীর মত জীবন যাপন করতেন সে ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা ফটো ছিল । তাতে বুঝা যায় যে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন ।

প্রেমল ঠাকুর

শ্রীপ্রলয় মজুমদার

মানুষের এই জাতীয় জিজ্ঞাসার জবাবে ঠাকুর বলেন– ধর্ম যদি হয়, সপরিবেশ বাঁচা বাড়া তাহলে বাঁচাবাড়ার জন্য যে সব কর্মের প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা তো আপনাকেই করতেই হবে। সকলকে দিয়ে সব কাজ হয় না, যার যেমন বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার, সে তেমনতর কাজ পারে ভাল। তাই প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কাজের ব্যবস্থা রাখতে হয়। কাজগুলি যত সুষ্ঠু, দক্ষ ও ক্ষিপ্রভাবে করতে শেখে মানুষ, তত তার যোগ্যতা বাড়ে, চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়, আবার পরিবেশের সেবাও হয় তাকে দিয়ে।

স্বভাবতই এমনতর জীবনে শিক্ষার একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। ঠাকুর সেই ভূমিকাকেই গুরুত্ব সহকারে ভেবেছেন। শুধু ভাবাই নয়। তার কৌশল, পরিকল্পনা, প্রয়োগ ও তাৎপর্য্য ঠাকুর তাঁর আশ্রমের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, –তপোবন বিদ্যালয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করে তিনি কিন্তু সফলকাম হয়েছিলেন। ঠাকুরের শিক্ষাক্রমের ভিতরে কোন বিভাগীয় বিভাজন নেই। বরং সামগ্রিকত্ব আছে। যা পড়া হবে, তার একটা বাস্তবীকরণ, প্রায়োগিক উপযোগিতার হাতে কলমে অনুভবের ব্যাপার আছে। ফলে শিক্ষা কিন্তু আর শুধু মস্তিষ্কের বিষয় হয়ে থাকে না। সমগ্র চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। অভ্যাস-ব্যবহারে আত্মীকৃত হয়ে যায়। অভ্যাস-ব্যবহারে আত্মীকৃত হয়। তাতে শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক ও পরিবেশের সামগ্রিকত্ত্বের সাথে দেশেরই সঙ্গেই যেন এক নিবিড় সংযোগ হয়। যা কি না সর্বতোভাবেই গ্রহণীয় প্রয়োজনীয় এবং জীবনীয়ও।

ঠাকুরের দিব্য জীবনের থেকেই কিন্তু আমরা অনায়াসেই অনুভব করতে পারব–ঠাকুরের ব্যক্তিনির্মাণ যজ্ঞের আয়োজন। ঠাকুরের দিব্য জীবন দেখেই বোঝা যাবে, –ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের ভাবী প্রজন্মের জন্যই নিভৃতে নির্জনে একান্তে কেমন জীবনধর্মী আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৯৪২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর। সকাল বেলা। ঠাকুর তাঁর সেজো ভাই এর বারান্দায় বসে কথা বলছেন সকলের সঙ্গে। নানা রকম কথ াবার্ত্তা থেকেই শিক্ষা প্রসঙ্গ আলোচনা হতেই ঠাকুর বললেন, যা কিছু পড়, তার একটার সঙ্গে আর একটার যোগসূত্র কি, সেটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো। যেমন, পদার্থবিদ্যায় তাপ, আলো, শব্দ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি হয়তো পড়ছ, বুঝতে চেষ্টা করো, এগুলির একটার সঙ্গে অন্য প্রত্যেকটার কি সম্পর্ক। আবার পদার্থবিদ্যার সঙ্গে অন্য প্রত্যেকটার কি সম্পর্ক, তাও ভেবে দেখ। আবার পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে অংকের যোগাযোগ কি, তাও ভেবে দেখ। বাস্তব ব্যবহারিক জীবনে এর কোনটার কার্য্যকারিতা কি, তাও ধীইয়ে দেখো। যা পড় তা লিখবে, আর নিজে যে জিনিসটা বুঝলে, তা সাধারণ মাথাওলা একজন অশিক্ষিত লোককেও বোঝাতে পার কি না, চেষ্টা করে দেখবে। অশিক্ষিত লোকের কথা এইজন্য বলছি যে, তাকে বোঝাতে গিয়ে ঠিক পাবে, কারিকুরি বাদ দিয়ে তোমার সহজ বুঝা কতটা বোঝা হয়েছে। আর শুধু বিজ্ঞানের বই নিয়ে যদি থাক, তাহলে কিন্তু একঘেয়ে হয়ে যাবে। তাই মাঝে মাঝে কলা, সাহিত্য ইত্যাদিও পড়বে। তাতে বিজ্ঞানের একটা কলাসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারবে। বিজ্ঞানটা আরও মনোরম লাগবে তোমার কাছে। এইভাবে যদি পড়, তবে সে পড়া মজ্জায় মিশে যাবে। কিছুতেই ভুলবে না। যেমন নিঃশ্বাস নিতে কিছুতেই ভুল হয় না। এইভাবে শিক্ষা হলে চলনার ধাঁজই উন্নত হয়ে উঠবে। অনুসন্ধিৎসা ও মননশীলতার অনুশীলন তোমার সাথের সাথী হয়ে থাকবে। ডিগ্রি পেয়েই মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাবে না।

বড় আশ্চর্য্য আকর্ষণীয় মানুষ এই ঠাকুর। জীবনের মধ্যেই যেন এর সমস্ত সমাহার। একই মানুষের কাছে ভ্রুণ থেকে বিশ্বের কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সহ শিক্ষার, দেহ থেকে দেহাতীত স্তরের, বিজ্ঞান থেকে বিচক্ষণতার সাথে দাম্পত্য জীবন নির্বাহর বিষয় যেমন, তেমনি সাধনা তাপস্যার নাদ জ্যোতি শব্দসহ নানা স্তরের সঙ্গতি সূত্রসহ যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞান ব্যাখ্যা, আর যেন এরই পাশাপাশি লোকপালী লোকরঞ্জনী ব্যবহার সবই যেন মূর্ত্ত। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, ধারণ পালন পোষণের এক সম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের বিগ্রহ ঠাকুর। তাই তো ঐ অমন পূর্ণাঙ্গ মানুষের প্রতি অনুরাগসমন্বিত টান ভালোবাসাই ক্রমাগত তাঁর ইচ্ছা আশা আর আকাঙ্ক্ষার বাস্তবীকরণের চিন্তা মনন ধ্যানই কিন্তু ঐ চরিত্রের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে।

ঠিক এই প্রাসঙ্গিক সূত্র ধরে আবার একবার ঠাকুরের দিব্য জীবনের দিকে তাকাব। ফিরে দেখব, তাঁর জীবনের অত্যন্ত ছোট্ট একটা মুহূর্ত্তকে। যা আমাদের কাছে মানচিত্রের মতোই বলে দেবে–মানুষের সাথে, পরিবেশের সাথে, আমাদের

ব্যবহার, আচরণ, ভাষা ঠিক কেমন হওয়া দরকার। সহনশীলতার সাথে সহমর্মিতার সংযোগ কেমন। অনুভব করা সম্ভব হতে পারে যে, সংহতি ঠিক কেমন করে একটা ব্যক্তি থেকে উদ্ভূত হয়ে বহুতে বিবর্দ্ধিত হয়ে উঠতে পারে।

১৯৪২ সালের ২রা অক্টোবর। সকালে হিমাইতপুরে আশ্রমে পদ্মার বাঁধের ধারে বসে ঠাকুর সকলের সাথে কথা বলছেন। দীক্ষার পরে ঠাকুর সকলকেই খালি পেটেই থানকুনি পাতা খেতে বলেছেন। শরীর আর স্বাস্থ্যের জন্য সকলের পক্ষেই এটা কিন্তু পালনীয়। বিশেষ করে দীক্ষিত মানুষেরা নিজেদের দীক্ষার পরেই শুধুমাত্র ঠাকুরের নির্দেশে, তাঁকে খুশী করার, তৃপ্তি দেওয়ার আগ্রহ নিয়েই অনেক অনভ্যাসের মধ্যেও অনেক কিছু চেষ্টা করে থাকেন।

ঠিক তেমনি একজন দীক্ষিত মানুষ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি যে থানকুনি পাতা খাওয়ার কথা বললেন, আমি থানকুনি পাতা পাব কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে জনৈক দীক্ষিত একজন আশ্রমকর্মী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন– তাও কি ঠাকুর এনে দেবেন নাকি? খুব তো আবদার!

ঠাকুর সামান্য ধমকের সুরে সঙ্গে সঙ্গে বললেন– তোমার কাছে যদি এর আবদার না টেকে, তাহলে আমার কাছে ছাড়া কার কাছে আবদার করবে? রোগা মানুষটাকে খুব তো কড়া কথা শুনিয়ে দিলে, সহানুভূতি সহকারে এটা বললে না আপনি ভাববেন না, থানকুনি পাতা আমিই যোগাড় করে দিতে চেষ্টা করব। তাহলে যে লোকটা একটু বুকে বল পায়, তা কি বোঝ না? নিজের অসুখ বিসুখ করলে মনের অবস্থা কেমন হয়, তা কি মনে থাকে না? নিজের অসুখ বিসুখ করলে মনের অবস্থা কেমন হয়, তা কি মনে থাকে না? তোমরা ভাব, মানুষকে আমার কাছে ঠেকিয়ে রাখলেই আমাকে স্বস্তি দেওয়া হয়। সত্যিকারের স্বস্তি যদি আমাকে দিতে চাও, তবে মানুষের দুঃখ কষ্টের সময় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও, তাদের এমন করে আগলে ধর, যাতে তাদের আমার কাছে আসার প্রয়োজন না হয়।

পরিবেশের এমন ক্রমাগত চাপ আর ধাক্কার মাঝেও ঠাকুর অচঞ্চল স্তিতধী অনড় থাকতেন ভালবাসায়। সে ভালোবাসা সত্যিই অবর্ণনীয়। পশুপাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ থেকে মানুষ পর্য্যন্ত। সবার প্রতিই, সবার মতো করেই। সত্যি সত্যিই লৌকিক জগতে কোন মানুষের জীবনে এমন চরিত্র অসম্ভব। সুতরাং ঠাকুরের জীবনে এমন রকমটাই যেন অলৌকিক বলে মনে হয়।

আমাদের মতো অদক্ষ, অপটু, অসংগত, প্রবৃত্তিতাড়িত সব মানুষ নিয়েই ঠাকুরের আন্দোলন। সুতরাং ঠাকুরের অপেক্ষাও যেন অনন্ত। তবুও ভালোবাসার টানে নাকি অপেক্ষার সময় কম হয়। হিমাইতপুর! পাবনা! সৎসঙ্গ আশ্রম। পদ্মার তীরে–বাঁধের ধারে। পদ্মা আর আকাশের সঙ্গম মনে হয় যেখানে, সেই দূর দিগন্তের দিকেই চেয়ে। ছোট বড় মাঝারি নানা মানের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। খুব সামান্য শব্দ ছলাৎ ছলাৎ ছলাৎ–! অপেক্ষার যেন এক একটা কম্পন আশ্রমের নিয়ত বাসিন্দা, কর্মী শ্রদ্ধেয়া কালীদাসিমা এসে বললেন– অত কথা বললে ঘুম আসতে চায় না। আপনার শরীরও তো ভাল নয়। ঠাকুর বললেন– এত কথা আমার বলতে হয় কেন জানিস? কালীদাসিমা বললেন– কেন? ঠাকুর অত্যন্ত বেদনার্ত স্বরে বললেন– তোদের অবাধ্যতার জন্য। তোরা কথামতো চলিস্ না। পাথরের মতো অচল থাকিস্। কথামতো কাজ তো করিসই না। আজেবাজে গল্প না করে নিজেদের মধ্যে এইসব প্রসঙ্গ যত করতে পারবে ততই ভাল। তোমার দেখাদেখি আর পাঁচজনেও এটা শুরু করবে। আমার কথাগুলি যে অন্যের কাছে পৌঁছে দিবি, তাও দিস্ না। আমি কোন কথা বলতে তো বাকি রাখিনি!

আমার স্মৃতিতে আজও ঠাকুরের সেই তামাকের অম্বুরী গন্ধ ভেসে আসে। গুড়ুক গুড়ুক শব্দ ভাসে। রিং করে ধোঁয়া ছাড়া! তামাকের শেষ সুখটান! হাঁ করে গালভর্ত্তি ধোঁয়া ছাড়া সব মিলিয়ে মনে হয়, এই তো ঠাকুর আমার সামনেই। কথাগুলো বারবার আসা যাওয়া করে। নাম করবি। খুব করে নাম করবি। নাম আর নামী অভেদ আর অভিন্ন। সব সময় সব কাজে সমানে নাম চালাবি।

স্মৃতি সচেতন হলেই সযত্নে ভাবি– আমার ভিতরে ভিতরে সব সময়ে সব কাজে নাম চলছে তো! আমরা পাঁচজনে একত্রিত হলে ঠাকুরের ইচ্ছাগুলো কেমন করে বাস্তবায়িত করবো–ভাবছি তো আমি! সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব বোধ করি– আমার বৃত্তিবিমগ্ন ভাবনার বৃত্তেই বন্দী আমি। সেই প্রবৃত্তিতাড়িত পথেই আবর্তিত হচ্ছি।

অথচ, আমার সেই পবিত্রতম, জীবনের ভাগবত শুভ সেই অমৃতলগ্নের যোগে-দীক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণেই তো আমি ঠাকুরেরই সামনে শপথ নিয়েই অঙ্গীকার করেছিলাম– অদ্য হইতে তোমাকেই প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের যজ্ঞ হোক্। সেই সময়ে আমি তো কোনও কথা উচ্চারণ করতে বাকি রাখি নি। সেই দীক্ষার সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত হয়তো

অনুসরণে-অনুশীলনেই থেকে গেছে অনেক বাকি । তাহলে ঠাকুরেরই প্রতি আমার ভালোবাসাটাই কি আজও বাকি থাকে গেছে!

সংশ্লেষতা

সেই সময়ে আমরা দেওঘরে পুরন্দহের যশোদালাল রায় রোডে শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে থাকি । তার আগে চৌধুরী ভিলায়, বাড়িটা নতুন কেনার পরেই বেশ কিছুদিন থেকেছি । তারও আগে থেকেছি হাউজারম্যানদার অক্ষয় স্মৃতিবাড়িতেই । এইভাবেই ঠাকুর যখন যেমন যেভাবে যেখানে বলেছেন, আমাদের থাকাটাও ঠিক সেইভাবে হয়েছে ।

পুরন্দহে রমেশদার বাড়িতে তাঁর স্ত্রী আর দুই মেয়ে নিয়ে ছিল তাঁর সংসার । মেয়েদের মধ্যে বড় ছিল মানু, আর ছোট মেয়ের নাম বুলা । বাড়িটার ডানদিকের যে বাড়িটা তারই দোতলায় থাকতেন শ্রীকাজল দাশগুপ্তের পরিবার । আর নীচের তলাতে থাকতেন শ্রীহরিবল্লভ নারায়ণদার পরিবার ।

জশিডি স্টেশন থেকে আসার পথে ডানদিকেই রেললাইন পার হয়েই মিশন স্কুলের ঠিক বিপরীত দিকের মোরাম রাস্তা ধরেই পুরন্দহে যাওয়া যেত । উঁচু বাঁধের মতো পথটুকুকে পার করলেই যশোদালাল রায় রোডের পথ ।

সকাল হলেই ঠাকুরের কাছে যেয়ে বসা । সারাদিন ঠাকুরের সামনে বসে অজস্র অসংখ্য মানুষের সমুদ্র দর্শনের সাথে সাথে, ঢেউ-এর মতোই উঠে আসা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সাথেই যেন সামঞ্জস্য সমাধানের সুস্পষ্ট সংকেতকে বুঝতে শেখার পীঠস্থান । দুপুরে বাড়ি এসে খাওয়া । দুপুরে অবশ্য কোনও কোনও দিন ঠাকুরের তিনজন আত্মজের কারো কারো বাড়িতেই কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের খাওয়ার ডাক পড়তো । বিকালে আবার ঠাকুর-বাড়ি । রাতে ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেলে, তিনি শুয়ে পড়লেই, সকলে একসাথে গল্প করতে করতে বাড়িতে ফেরা । মাঝে মাঝে আবার কোলকাতাতে এসেও থাকা হয় । শনিবার দেওঘর গিয়ে সোমবারেই চলে আসা হয়েছে । এমন করেও অনেকগুলো দিন কেটেছে । দিব্যি বেশ কেটে যাচ্ছিল কিন্তু আমাদের সেই সোনার দিনগুলো!

সেদিন সকালে ঠাকুর আবার বাবাকে ডাকলেন । ঘরে বিশেষ কেউ ছিলেন না । ঠাকুর ইশারা করে বাবাকে তাঁর মুখের কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন । বাবা একেবারে ঠাকুরের খুব কাছে যেতেই, ঠাকুর আমার বাবার কানের কাছে খুবই ফিস্ ফিস্ করে বললেন– আমি তোক্ যা যা করবের কবনে, তা কি তুই করবের পারবিনি?

বাবা বললেন– আঁজ্ঞে হ্যাঁ । কন কী করা লাগবি?

ঠাকুর এবার ভালো করে আমার বাবাকে পর্য্যবেক্ষণ করলেন । তিনি আবার বললেন– আমি তোক্ যা যা করবের কবনে, তা কি তুই করবের পারবিনি?

আমার বাবা এবারেও 'আঁজ্ঞে হ্যাঁ' বলাতেই ঠাকুর বললেন– এখন আয় গা । সময়মতো আমিই তোক্ ড্যাকে নেবনে । ফাঁকে ফাঁকে থাকিস ।

সেই সময় কলকাতার জনৈক কর্মীর খুব নামডাক । খুব কর্মব্যস্ততা । কলকাতার বাড়িতে তখন তাঁর দুখানা টেলিফোন । দিনের সব সময়েই বেজে চলেছে তিনি প্রাইভেট ফার্মে চাকরী করলেও, অমানুষিক পরিশ্রমে সমস্ত অঞ্চল ঘুরে বেড়াচ্ছেন । দেওঘর থেকে অহরহ হরদমই ঠাকুরের নানা রকমের নির্দেশ আসছে । ঘন ঘন ঠাকুর তাঁকে কলকাতা থেকে ডাকিয়ে নিচ্ছেন । মাঝে মাঝেই ঠাকুরের সাথে তাঁর প্রাইভেট কথা হচ্ছে । সভাসমিতি সম্মেলন অধিবেশন সৎসঙ্গ উৎসব তখন যেন তাঁর সারা বছর জুড়েই ।

ঠাকুর সে সময়ে তাঁকে দেশজুড়ে তিনকোটি দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য খুব করেই অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন । তিনি ছুটছেনও খুবই । দীক্ষাও হচ্ছে অনেক । সব মিলিয়ে কিন্তু বেশ গরম উদ্দীপক আবহাওয়া ।

সেদিন পার্লারে ঠাকুরের সাথে কলকাতার সেই বিশিষ্ট কর্মীর প্রাইভেট আলোচনা চলছে । আমার বাবা বড়াল-বাংলোর সিঁড়িতে অপেক্ষা করছেন, কখন ঠাকুরের ডাক আসে! সতু সান্যালদা আমার বাবাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখেই বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, ক্যারে! তুই শালা এখানে বসে ক্যা?

বাবা জানালেন– ঠাকুর বলেছেন, ফাঁকে ফাঁকে থাকিস । ডাকবের পারেন যখন তখন ।

বাবার কথা শুনেই হেসে উঠলেন সতু সান্যালদা । বেশ জোর ছিল সে হাসিতে । হাসতে হাসতেই অনেক কথাই যেন ইঙ্গিতেই জানালেন তিনি । বাবা জিজ্ঞাসা করলেন– হাসেন ক্যা?

তোর মত মানষেক্ একা একা রোদের ভিতরে সিঁড়ির উপরে বসায়ে রাখিছেন যিনি, তোর কি মনে আছে, প্রথম দিনই হিমেতপুরের আশ্রমে তাকেই তুই 'বদমাশ' বলে গাল পাড়িছিলি?

সতুদার কথাগুলোতেই আমার বাবার স্মৃতি ভিতরে ভিতরে সরব হলো । সেই সপ্রাণ স্মৃতিকে স্মরণ করেই আবার বাবা বললেন–বলছিলেন ঠাকুর, পচাল পারিস্ না । চুপ করে বসে পড় ।

দ্যাখ্ শালা বাপের ব্যাটা কাক্ কয়! তোর মতো মানষেক্ রোদে একা বসায়ে রাখার সেই হিম্মৎ আর কারো আছে নাকি? বোঝ, কী মানুষের কাছেই না আসিছি!

সতুদার কথাগুলো যেন ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অদ্ভুত তৃপ্তি আর আনন্দের শিরশির ভাবকে বইয়ে দিল । এক টিপ নস্যি নাকে দিয়েই বাবা বললেন সেই ফাট্কানেই তো আটকাইছি । বলেই বাবা হাসলেন । সতুদাও হাসতে হাসতে বললেন– থাক বসে । আমি ঘুরে আসি । রওনা হয়ে চলে গেলেন ।

বড়াল-বাংলোর সিঁড়িভরে ভরা রোদের তেজ । কিছুক্ষণ আগেই শ্রদ্ধেয় সতু সান্যালদার কথাগুলোই মনের ভিতরে বুদবুদের মতো ওঠাপড়ার খেলা খেলতে লাগলো । কতো রকমারী ভাবের মেঘগুলো মনের আকাশে একটা আকৃতির অবয়বক রচনা করলো । এবারে অনেকটা স্পষ্ট করে, স্বচ্ছভাবেই যেন চেনা যাচ্ছে গোবর মজুমদার । শক্ত কঠিন অহং আবরণের উদ্ধত দুর্বিনীত গোবর মজুমদার । সেই মানুষটাই এতক্ষণ ঠা-ঠা রোদের ভিতরে একা একা সিঁড়ির উপরে বসে আছে । কতো মানুষই যাতায়াতে জিজ্ঞাসা করলেন, সকলকেই একই জবাব জানাচ্ছেন । সকলে কি যে ভাবছেন, তা নিয়ে তো ভিতরে কোনও হোলদোল কিছু হচ্ছে না! বরং প্রত্যেকটা পল-অনুপলেই যেন এক সজাগ সতর্ক সচেতন প্রতীক্ষাতেই অপেক্ষমানতা-ঠাকুর কখন ডাকবেন!

কতোক্ষণ–কতো সময় যে পার হয়ে গেল কে জানে! তবে জানা গেল, ভিতরের সেই যে এক ভীষণ অহংকারী উদ্ধত দুর্বিনীত অস্তিত্ব ছিল, তা যেন কেমন করে ঠাকুরের প্রতিই একটা প্রবল অবর্ণনীয় টানেই যেন কীভাবে পরিবর্তিত হলো!

গোবরদা, ঠাকুর আপনাকে ডাকছেন । একজন বলেই কোথায় চলে গেলেন । বড়াল-বাংলোর সেই সিঁড়ি থেকে বাবা উঠলেন । ভিতরে কেমন ভরন্ত ভাব । আত্মসাক্ষাৎকারের মতোই । সেই যে অদৃশ্য অস্বচ্ছ অস্পষ্ট অস্তিত্ব–তাকে যেন চেনা গেছে । ধরা গেছে । ঠাকুরের অহংকারের যে অর্থবোধ ব্যঞ্জনা, সেই শব্দের সুরই যেন শরীরের প্রত্যেকটা কোষে অনুভব হচ্ছে । খুব সুন্দর একটা আনন্দের তৃপ্তি বোধের উদ্বেলনের উচ্ছ্বাসের ভাব বুকে করেই এলেন ঠাকুরের সামনেই ।

আমার বাবাকে দেখেই ঠাকুর বেশ উৎফুল্ল ভঙ্গীতেই বলে উঠলেন–এই তো গবরা আইছে! শালা কনে যে থাকিস্ সময়মতো তোগরেক্ ড্যাকে ড্যাকে পাওয়া যায় না । ও খুব ব্যস্ত কর্মী । ওর কি আর এহানে আমার কাছে একদণ্ড বসে থাকার সময় আছে! কথাটা বলেই তিনি এতক্ষণ প্রাইভেট করা কলকাতার সেই বিশিষ্ট কর্মীর দিকে তাকালেন ।

দৃষ্টি আকর্ষণ

সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার জন্য আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করুন । সেই সাথে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন ।

সৎসঙ্গ সংবাদ প্রেরণকারী/ লেখকবৃন্দের প্রতি সবিনয় অনুরোধ-পরিচ্ছন্ন কাগজের একপাশে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

-সম্পাদক

আমি তোমায় ভালবাসি

জগদীশ দেবনাথ

ছয়

Be concentric বা 'কেন্দ্রায়িত হও' এই দুই শব্দের বাক্যে সৎসঙ্গের সমগ্র ভাবধারাটি বিধৃত হয়ে আছে। সৎসঙ্গের জীবন দর্শনটি অতি সংক্ষেপে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, এমন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর এই দুই শব্দের বাক্যটির কথাই বলেছিলেন। এই কেন্দ্রায়িত হওয়ার কেন্দ্রবিন্দু বা লক্ষ্য হলেন ইষ্ট বা ঠাকুর। অচ্যুত আবেগ বা ভালবাসাই ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হতে অনুরাগী বা অন্তরাসী (Interrested) করে তোলে। ভালবাসা, আবেগ, অনুরাগ বা টান ছাড়া জাগতিক কোন কাজেও মানুষ সম্পৃক্ত হয় না। সেখানে হয়ত স্বার্থ বা মোহের প্রাধান্য থাকতে পারে। তবে, প্রিয়জন বা প্রিয়পরমের কাজে নিজেকে ন্যস্ত করায় স্বার্থ বা মোহের স্থান গৌণ, ভালবাসাই সেখানে মুখ্য। একারণেই পিতামাতা, গুরুজন, স্ত্রী-সন্তানের জন্য মানুষ যে দিনরাত খেটে চলে, তাতে তার বিরক্তি আসে না। নিজের কর্তব্য কর্ম বিবেচনায় হাসিমুখে প্রতিকূলতার যাতনা অবলীলায় সহ্য করে। আবার, ইষ্টকাজের পথটিও সবসময় কুসুমাস্তীর্ণ হয় না। নানা ঝামেলা-ফাসাদ-প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেই উদ্দেশ্য হাসিল করতে হয়। এই পথে যতই বিপদাপদ, ক্লেশ-যন্ত্রণা আসুক সেসব অম্লান বদনে সয়ে-বয়ে যেতে হয়। যন্ত্রণার জগদ্দল পাথরকে অবিরাম প্রচেষ্টায় জয়ের বন্দরে নিয়ে যেতে হয়। ক্লেশকে অকাতরে সুখে পরিণত করে চলার অবিরাম, অম্লান প্রচেষ্টাই একসময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার তৃপ্তিতে অঢেল করে তোলে। "তুমি কোনকিছু করতে প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি বিফল মনোরথ হও– ক্ষতি নাই, তুমি ছেড়ো না; ঐ অম্লান চেষ্টাই তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।"১ সেকারণে দরকার ইষ্টের আদেশ নির্বিচারে পালন করে চলা। কোনরূপ যুক্তিবুদ্ধি ও বিচার দ্বারা তাঁর নির্দেশ রদ, রহিত বা অমান্য করার ধৃষ্টতা না দেখানো। "কার্য সাধনের সময় তা হতে যে বিপদ আসবে তার জন্য রাজি থাকো, বিরক্ত বা অধীর হয়ো না। অনুসন্ধিৎসার সহিত যেমন করে তাকে জয় করতে পার, তেমনি করে তাই-ই করে চল– সফলতা তোমার দাসী হবে। ..... বিপদকে ফাঁকি দিয়ে ও পরাস্ত করে সফলতা-লক্ষ্মী লাভ কর, বিপদ যেন তোমায় সফলতা থেকে বঞ্চিত না করে। সুখ কিংবা দুঃখ যদি তোমায় গতিরোধ করতে না পারে– বরং আরও গন্তব্যে আপ্রাণ করে তোলে,– তবে তুমি নিশ্চয়ই গন্তব্যে পৌঁছিবে সন্দেহ নাই।"২

তাঁর বলাগুলি কথায় ও কাজে মূর্ত করে তুলতে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গের মত সুকঠিন মনোবল থাকা দরকার। নিজের বোধ-বিবেচনা, যুক্তি– বিচারকে গুরুত্ব না দিয়ে ইষ্টের ইচ্ছামাফিক চলাই তপস্যা। ফলে তপস্যার জেল্লায় কোন বাধা-বিপত্তিই একজন ইষ্ট-নিষ্ঠ ভক্তকে পরাস্ত বা পরাভূত করতে পারে না। পৌরাণিক যুগে মহর্ষি আয়োদধৌম্য তাঁর প্রিয় শিষ্য আরুণিকে ক্ষেতের জল নির্গমন স্থলে আল বাঁধার আদেশ করেছিলেন। কিন্তু জলস্রোত তীব্র থাকায় আল বাঁধতে অসমর্থ হয়ে আরুণি আলের উপর শুয়ে শরীর দিয়ে জলপ্রবাহ রোধের চেষ্টা করছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে আশ্রমে ফিরে না আসায় গুরুদেব আরুণিকে ডাকতে ক্ষেতের কাছে উপস্থিত হলেন। গুরুর ডাকে আল থেকে উঠে এসে শরীর দিয়ে জলস্রোত রোধের কথা নিবেদন করলেন। এতে গুরুদেব প্রীত হয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন– 'তুমি কেদারখণ্ড (ক্ষেতের আল) ভেদ করে উঠেছ বলে আজ থেকে তোমার নাম হলো উদ্দালক। গুরুর আজ্ঞা সঠিক পালন হেতু সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার কণ্ঠস্থ থাকবে।' এই উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুই স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে প্রথম এই নিয়ম চালু করেছিলেন– যে নারী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ করবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য নারীতে আসক্ত হবে, তারা উভয়ই ভ্রূণ হত্যার পাপে নিমগ্ন হবে। এই নিয়মই যুগে-যুগে নানা ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক বিবাহ পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। এ কারণে শ্বেতকেতুকে আধুনিক, সুস্থ, পরিশীলিত বিবাহ বিধানের জনক বলা যেতে পারে।

কাজেই গুরু বা ইষ্টের প্রতি অটুট টান বা ভালবাসা থাকলেই ইষ্টাদেশ পালনের শক্তি অর্জিত হয়। ঠাকুর বা ইষ্ট হলেন অনন্ত অস্তিত্বের সীমায়িত ব্যক্ত প্রতীক। ব্যষ্টি জীবন তার দয়ার দান। অনন্ত, অসীম অস্তিত্ব থেকেই উৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ব্যষ্টি বা আমি। 'হে পরম কারুণিক! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বানুস্যূত! ব্যপ্ত প্রাক্ প্রথমবাক্! সর্ব্ব স্বর্গ সর্ব্বহৃদয় প্রাণন পরিমল অদ্বিতীয়

ঈশ্বর! জীব জগৎরূপে প্রতিভাত! রক্তমাংস-সঙ্কুল-উদ্ভাসিত তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান! এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ। ....।'৩ অনন্ত, অসীম বিশ্বসত্ত্বা– সান্ত, সসীম রক্তমাংসের দেহধারীর রূপ পরিগ্রহ করেছেন বলেই এই ক্ষুদ্র আমি তাঁকে দেখার বা অনুভব করার সুযোগ পেয়েছি। তাই, সেই বৃহতের সেবায় নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বা আমিত্ব উৎসর্গ করতে পারাই জীবনের সার্থকতা। এই বোধের উদ্দীপন ও বাস্তবায়নই ভালবাসা।

ঠাকুরের প্রতি গভীর অনুরাগ বা ভালবাসার নজির আমরা ভক্তজীবনী আলোচনায় পাই। যে তিন ভক্ত, সাধক পুরুষের ব্যক্তিত্ব, চরিত্রবল, সাধন-ভজন প্রসূত কর্মযজ্ঞে সৎসঙ্গের ভাবধারা বিকশিত হয়েছিল, তাদের দ্বিতীয়জন হলেন মহারাজ অনন্তনাথ রায় (প্রথমজন কিশোরীমোহন দাসের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে)। অনন্তনাথ ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৬ আশ্বিন পাবনার কাশীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক অনটনের কারণে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মাত্র সপ্তম মান পর্যন্ত হয়েছিল। পরে তিনি হিমাইতপুরের ডাক্তার বসন্তকুমার চৌধুরীর নিকট কম্পাউন্ডারি ও এর সাথে কিছু ডাক্তারি বিদ্যাও আয়ত্ব করেন। তখন তার বয়স ষোল বছর। সাত বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ এবং কৈশোরেই মাতৃবিয়োগের দুইবছর পর অনন্তনাথ বিয়ে করেন। বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই একটি পুত্র সন্তান রেখে স্ত্রী মারা যান। শিশুপুত্রটিও মাত্র ২২ দিন জীবিত থেকে পরপারে পাড়ি দেয়। এসব বিয়োগান্তক ঘটনায় অনন্তনাথ মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পরেন এবং আত্মার শান্তি কামনায় রংপুরস্থ তাঁর ভগ্নিপতি রাধারমণ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

অনন্তনাথ বসন্ত চৌধুরীর বাড়িতে থেকেই কম্পাউন্ডারি শিখতেন। সেই সময় থেকেই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই ঘনিষ্ঠতা তাঁর জীবনে নবপ্রাণের সঞ্চার করে। ভগবান প্রাপ্তির একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিলই। স্ত্রী-সন্তান বিয়োগের পর তিনি ভাবতে লাগলেন যে, ভগবৎ প্রাপ্তির সাধনার এটিই মোক্ষম সুযোগ। ফলে তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করলেন এবং শব্দ-শ্রবণ, জ্যোতি-দর্শন প্রভৃতি সাধন জগতের নানা দুর্লভ বস্তুর সন্ধান পেলেন। তবে ভগবানকে সাক্ষাৎ নরদেহে না পাবার বেদনায় নতুন দেহে সাধনা করে ভগবৎ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তিনি জীবন নাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। কাশীপুরের মাঠে নির্জন যে সাধনগৃহ ছিল তার আড়িকাঠে ফাঁসিতে প্রাণত্যাগে মনস্থ করেন। তখন সন্ধ্যা। মুষলধারে বৃষ্টি। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ বাড়িতে ডাক্তারখানায় সমাগত রোগিদের সঙ্গে আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে দৌড়ে প্রায় আধক্রোশ রাস্তা পেড়িয়ে কাশীপুরের মাঠে অনন্তনাথের সাধনগৃহের দরজায় সজোরে আঘাত করতে করতে চিৎকার করে বলতে লাগলেন– "অনন্ত রে দরজা খোল, দরজা খোল, ভিজে গেলাম, শিগগির দরজা খোল।"৪ অনন্তনাথ তখন ফাঁসির রশি গলায় পরার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, হঠাৎ বাধাকে ভগবান প্রাপ্তির পথে অন্তরায় মনে করে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এদিকে অনুকূলচন্দ্রের অবিরাম আঘাতে দরজা খুলে গেল, তিনি ঘরে প্রবেশ করে অনন্তনাথকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন– 'আমি কী করেছি যে, তুই আমায় ফেলে চলে যাচ্ছিলি? ভগবান, ভগবান বলে পাগল, ভগবান যে তোর পাছে-পাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"৫ এদিকে অনুকূলচন্দ্রের সাথে আলাপ-আলোচনায় প্রায়শই জননীদেবীর সাধন-ভজনের কথা উঠে আসতো। জননীদেবীর তপস্যা, সাধন-পদ্ধতি, ইষ্ট-নিষ্ঠা ও গুরুকৃপার নানা অপূর্ব কাহিনি শুনে অনন্তনাথ অবশেষে তাঁর নিকটই পুণরায় সৎমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন। সন্তমতের চতুর্থ সদগুরু সরকার সাহেবের মূর্তি স্থাপন করে নামধ্যান চালিয়ে যেতে থাকেন। পরে অবশ্য একদিনের ভাববাণীতে ঠাকুর যখন বললেন– 'অনন্ত রে, কোথাও রওনা হতে হলে, মেল ট্রেনে যাওয়া যায়, Mixed ট্রেনে যাওয়া যায়, আবার গরু-মহিষের গাড়িতেও যাওয়া যায়। ইহা বুঝে যা করার হয় করবি।' ভাবাবস্থায় ঠাকুরের এরূপ অনেক নির্দেশ পেয়ে অনুকূলচন্দ্রের ভাগবত্তা সম্পর্কে স্থির বিশ্বাসী হয়ে অনন্তনাথ তাঁকেই গুরুপদে বরণ করলেন এবং মায়ের নিকট হতে প্রাপ্ত সাধনপদ্ধতি আপ্রাণতার সাথে অনুসরণ করতে লাগলেন। (দ্র. ব্রজগোপাল দত্তরায়– শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, জীবনীগ্রন্থের অনন্তনাথ অধ্যায়।) ঠাকুরও তাঁকে সাধন-ভজন সম্পর্কিত নানা উপদেশ প্রদান করে উৎসাহ দিতেন। সে সময় কাশীপুরের মাঠে সাধনগৃহে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও আহার-নিদ্রা-মলমূত্র ত্যাগ বর্জিত অবস্থায় উপর্যুপরি ৫/৭ দিন, কখনো ১/২ মাস একাসনে ধ্যানমগ্ন থেকে সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এ সর্ম্পকে বলেছেন– 'অনন্তর সাধনা কি কঠোর! এমনও হয়েছে কতকাল ঘর থেকে বেরোয়নি। আমি একদিন ঘরে গিয়ে দেখি সারা শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা, বুকে একটুও স্পন্দন নেই। মনে করলাম, মরে গেল নাকি? তাঁর সমস্ত গায়ের পিঁপড়া ছাড়িয়ে দেই।

মাছিগুলো কোনরকমে গা থেকে তাড়িয়ে দেই । তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসি । শেষে ধীরে-ধীরে অনেকক্ষণ পর জ্ঞান হল । শরীরের অবস্থা দেখে মনে হত আর বেশিদিন বাঁচবে না ।'৬

সাধনকালে অনন্তনাথ একবার শুধু দুধ পান করে ও মৌনব্রত পালনপূর্বক ছয়মাস কাটিয়েছিলেন । তখন সাধন-ভজন বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সাধনার স্তরভেদ সম্পর্কিত বিষয় জেনে নিতেন । একবার দীর্ঘকাল ধ্যানমগ্ন থেকে তিনি এই অনুভূতি লাভ করেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রই পূর্ণ ভগবান এবং জগতে যত অবতার পুরুষের আগমন ঘটেছে তিনি সকলের পরিপূরক ও বর্তমান পুরুষোত্তম ।

অনন্তনাথ তপস্যার বলে সাধনজগতের যেরূপ উচ্চস্তরে আরোহন করেছিলেন সে সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন– 'সন্তমতে পূর্ব-পূর্ব গুরুদের নামের সহিত 'মহারাজ' শব্দ যুক্ত হতে দেখা যায় যথা– স্বামিজী মহারাজ, হুজুর মহারাজ, মহারাজ সাহেব প্রভৃতি; অনন্তনাথও ঐ জাতীয় একজন উন্নত সাধক, সুতরাং তাহাকেও মহারাজ বলিয়া ডাকা উচিৎ ।"৭ অনন্তনাথের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে মহারাজ আখ্যা দেন । তবে ঠাকুরের এমন মুল্যায়নের পরও অনন্তনাথ নিজেকে সাধারণ স্তরের মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতেই অভ্যস্ত ছিলেন । সৎসঙ্গ জগতের খ্যাতিমান, বিদ্বান পঞ্চানন সরকার মহাশয় প্রথম জীবনে ছিলেন– তাঁর নিজের ভাষায় 'মহাদাম্ভিক', 'মহাতার্কিক' । যদিও সৎসঙ্গে দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁর কঠোর সংযম ও পরিশ্রম সেই সাথে সর্ব বিদ্যায় পারদর্শিতা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে । সেই তিনিই যখন শুনলেন যে, পাবনা হিমাইতপুর থেকে মহারাজ নামক এক লোক এসেছেন, যিনি মানুষকে দুই মিনিটে Convince (বুঝিয়ে) করে ইষ্টপথে নিয়ে আসতে সক্ষম । মহারাজ তখন কোলকাতার ২৮ বি, অখিল মিস্ত্রি লেনের একটি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন । পঞ্চানন সরকার ঐ বাড়িতে ৩ তলার ঘরে কম্বলের আসনে উপবিষ্ট দীর্ঘদেহী মহারাজের সামনে দাঁড়িয়েই শুধালেন– এখানে মহারাজ কে আছেন মহাশয়! তার কথায় অনন্তনাথ বলে চললেন– মহারাজ বলতে যা বুঝা যায় আমি তা কিছু নই, সোজাসুজি দাদা, ঠাকুর তামাক খান, আমার তামাক সাজা তিনি খুব পছন্দ করতেন । কাজেই পরমানন্দে ঐ কাজটা আমিই বেশিরভাগ সময় করতাম । কিছুদিন ওমনি যেতেই বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করে আমাকে বলতে লাগলেন– "তামাক সাজার মহারাজ । তার পরে বড় হলে ব্যাঙাচির যেমন লেজটা খসে যায়, আমার বেলায়ও ঠিক তাই হলো । 'তামাক সাজার' কথাটা খসে গিয়ে মহারাজ'টা টিকে গেল । হতে-হতে মহারাজ হয়ে পড়লাম । এই কিন্তু ব্যাপার দাদা ।"৮

পঞ্চানন সরকারের সঙ্গে মহারাজের একাধিক্রমে ১৪ দিন তর্ক হয়েছিল । ১০ দিন তর্ক চলার পর তার অনুভূতি হলো যে, তিনি হেরে গেছেন । অতঃপর প্রাতিষ্ঠানিক স্বল্প শিক্ষিত (৭ম মান নাগাদ পড়াশোনা) মহারাজ অনন্তনাথের কাছেই দর্শনের এম এ, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তার্কিক, বিদ্বান পঞ্চানন সরকার মহাশয় সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করেন । শুধু যে, পঞ্চানন সরকার মহাশয় মুগ্ধ হয়েছিলেন তা নয় । অনন্তনাথের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সামান্য হলেও তিনি ছিলেন অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার । শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃদেবের শ্রাদ্ধের সময় বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মহাসম্মেলনে অনন্তনাথ যে তত্ত্বালোচনা করেছিলেন তাতে তাঁর অপূর্ব জ্ঞান ও অদ্ভুত বিচারশক্তির পরিচয় পেয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হয়েছিলেন ।

নিবন্ধের শুরুতে আমরা আরুণির সুদৃঢ় গুরুভক্তির আখ্যান নিবেদন করেছি । মহারাজ অনন্তনাথ রায়ের অটুট ইষ্টনিষ্ঠা ও প্রগাঢ় গুরুভক্তির অজস্র ঘটনা থেকে এখানে একটি উল্লেখ করা হলো । একবার আশ্রমে কোন প্রাণীর মৃতদেহের পঁচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল । ঠাকুর ঐ পথে যাচ্ছিলেন । কিসের গন্ধ খোঁজ করতে বলায় জানা গেল একটা পঁচা গরুর ঠ্যাং জঙ্গলে পরে আছে, সেখান থেকে দুর্গন্ধ ভেসে আসছে । শ্রীশ্রীঠাকুর অনন্তকে ডেকে বললেন– "অনন্ত রে ডাক্তারখানার পিছনে মরা গরুর ঠ্যাং নাকি পরে আছে, তা থেকে ভয়ানক দুর্গন্ধ আসছে, তুই এক্ষুণি গিয়ে মুখে করে কামড়ে ওটাকে ঐ নদীর চরায় দূর করে ফেলে দিয়ে আয়তো ।"৯ অনন্তনাথ ঠাকুরের আদেশ পেয়েই সানন্দে ঐ পূতি গন্ধময়, পোকাপড়া গরুর ঠ্যাং খানা দাঁতে কামড়ে নদীর চরায় ফেলে আসেন । ইষ্টাদেশ পালনে এমন প্রশ্নশূন্য আনুগত্য নিতান্তই বিরল ।

ভারতীয় সোসাইটি আইন ১৮৬০-এর ২১ ধারামতে হিমাইতপুর পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রম 'সৎসঙ্গ' নামে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রেজিস্ট্রিকৃত হয় । প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ৯ সদস্যের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেন । জননী মনোমোহিনী দেবী কমিটির সভানেত্রী এবং মহারাজ অনন্তনাথ রায় ছিলেন সহ-সভাপতি । কমিটির সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে সশীলচন্দ্র বসু ও ব্রজগোপাল দত্তরায় । তাছাড়া প্রভাসচন্দ্র

চক্রবর্ত্তী (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা), কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, অবিনাশচন্দ্র অধিকারী, ডাক্তার কিশোরীমোহন দাস ও ডাক্তার যতীন রায় সদস্যপদভুক্ত ছিলেন। সংঘের কাজকর্ম ও গুরুদায়িত্ব পালনে অনন্তনাথ সচরাচর আনন্দ পেতেন না। নীরবে, নিরন্তর ধ্যান-সাধনায় নিমগ্ন থেকে লোকসংগ্রহ ও লোককল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর কর্তব্যকর্ম। তাঁকে বলতে শোনা গেছে যে– "আর এই সকল বিষয়ে যাইতে ইচ্ছা হয় না। মনটাকে এত নিচে নামাইয়া আনিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয় তবু করিতেই হইবে, কারণ ইহা মালিকের ইচ্ছা।"১০ এই মালিক বলতে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকেই বুঝিয়েছিলেন। আবার ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন– "দ্যাখ্ অনন্ত, লোকহিতকর কাজ না করে শুধু বসে বসে নাম-ধ্যান করলে ধর্ম হয় না। সাধনা যেমন করতে হবে, বাস্তবকর্মে ইষ্টের নির্দেশও তেমনি মূর্ত করে তুলতে হবে।"১১ ইষ্টকে খুশি করা তাঁর ইচ্ছাপূরণের নিমিত্ত হতে পারাটাই ছিল অনন্তনাথের সাধনা। কোথাও গেলে ভাল যা কিছু চোখে পড়ত তা ঠাকুরের জন্য নিয়ে আসতেন। ঠাকুর পরিবারের যা কিছু প্রয়োজন সবই অনন্তনাথের যোগানে মিটে যেত। ঠাকুরের সংসারকে নিজের সংসার ও ঠাকুরের জনক-জননীকে নিজ জনক-জননী জ্ঞানে সেবা, সহযোগিতা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মাতীরে নিজের শয়নগৃহের পাশে খড়ের ঘরে অনন্তনাথের মাতৃদেবীর স্মৃতিতে 'ব্রহ্মময়ী' ঔষধালয় নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে অনন্তনাথকে এর সর্ববিধ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অনন্তনাথের সেবা-চিকিৎসায় আশপাশের শত-শত দরিদ্র পীড়িত মানুষ সুস্থ, সবল জীবনের স্বাদ পেয়েছে। তাঁর রোগ নির্ণয় ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। অনেক দুরারোগ্য রুগীকে তিনি সহজ প্রক্রিয়ায় নিরাময় করেছেন। ফলে, হিমাইতপুরের গণ্ডগ্রাম হতে কলকাতা মহানগরীতে পর্যন্ত আমন্ত্রিত হয়ে কত পরিবারের কত মানুষের কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা দিয়ে রোগমুক্ত করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর এই সজাগ ও সুতীক্ষ্ণ চিকিৎসা পদ্ধতির ফলে তখন হিমাইতপুর আশ্রমে একাদিক্রমে ১০ বছরে কোন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। সে কারণে সকলের বদ্ধ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল যে, ঠাকুরের আশ্রমে মৃত্যুর কোন ঘটনা নেই। আশ্রমে কেউ মরে না– মরবে না। তবে কানাইলাল নামে একজনের মৃত্যুতে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। সে কারণে তপোবন প্রাঙ্গণে বিরাট সভা হয়েছিল এজন্যে যে,– কেন আশ্রমে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। সেই সভায় মহারাজকে ডাকা হলে তিনি দুই/তিন ঘন্টা বক্তৃতা করে সমবেত জনমণ্ডলীকে মৃত্যুর কারণ বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার সমাধান চেয়ে যেসব পত্র লিখতেন ঠাকুরের নির্দেশমত মহারাজ সে সবের উত্তর দিতেন। এসব পত্রের কতগুলো সংগ্রহ করে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৩০ ভাদ্র 'সান্ত্বনা' নামে বই আকারে ছাপা হয়। সাধন সংক্রান্ত উপদেশ ব্যতীত অনেক জটিল তত্ত্বের সহজ মীমাংসাসহ জ্ঞান ও ভক্তি জগতের ভাবরাজিতে পত্রগুলি ভরপুর ছিল। ভাবের গভীরতায় ও ভাষার মিষ্টতায় এগুলো ছিল অপূর্ব। 'সান্ত্বনা' পাঠে বহু মানুষ সান্ত্বনা পেয়েছেন। বইটি তৎকালীন বহু সাময়িকপত্রের প্রশংসালাভ করেছিল, এমনকি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা প্রবাসী এই মন্তব্য করেছিল যে– "এই পত্রগুলিতে লেখকের জ্ঞান, ভক্তি ও কাব্যশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মার্থ বিষয়ক পত্রগুলির মধ্যে সাহিত্যেরও অনেক উপাদান আছে।"১২ সৎসঙ্গের সমকালীন পত্রপত্রিকায় তার যে সকল মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় মেলে।

মহারাজ অনন্তনাথ সবসময়ই নামময় থাকতেন। আদি বীজাত্মক নাম অবিরাম স্মরণ-মনন বা জপের ফলে তার শরীরে যে তাপ প্রবাহের সৃষ্টি হত সে পরিচয় পেয়েছিলেন 'অমিয় বাণীর লেখক– শ্রীঅশ্বিনীকুমার বিশ্বাস। সেবার ঠাকুর ও অনন্তনাথ অশ্বিনীদার বাড়িতে ছিলেন। রাতে ঘরে দুটো চৌকির একটিতে ঠাকুর অন্যটিতে অনন্তনাথ ঘুমিয়েছিলেন। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে অশ্বিনীদা অনন্তনাথের পাশে শুয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে অনন্তনাথের হাত অশ্বিনীদার বুকের উপর পড়ায় প্রচণ্ড তাপ ও অসহ্য যন্ত্রণায় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রচণ্ড তাপবোধ ও অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর ঘামতে থাকায় তিনি– 'বাবারে বাবা', 'গেলাম গেলাম' বলে চিৎকার দিতে থাকেন। যন্ত্রণাদগ্ধ অশ্বিনীদার চিৎকারে ঠাকুর ও অনন্তনাথ দুইজনের ঘুম ভেঙ্গে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যভরা কণ্ঠে বলেন– 'ওরে বাবা, আপনি আমার কাছে না শুয়ে ঐ ডাকাতের কাছে শুতে গেলেন কেন?'১৩

ঠাকুরের আপত্তি সত্ত্বেও সৎসঙ্গীদের আমন্ত্রণে অনন্তনাথ ১৩৪১ বঙ্গাব্দে যাজন কাজে বাইরে যান। ঘোরাঘুরি করে বসন্ত রোগ নিয়ে তিনি আশ্রমে ফিরেন। ঠাকুর স্বচক্ষে তার

অবস্থা দেখে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে ওষুধের সন্ধান করেন আর হা-হুতাশ করে তাঁর কথা না শোনার জন্য দুঃখ করেন । দুর্বিসহ রোগযন্ত্রণায় ছটফটরত অনন্তনাথের ঘরে ঠাকুর ও জননীদেবীর ছিল অবাধ যাতায়াত । ভক্ত বঙ্কিম রায় তার শুশ্রূষার দায়িত্বে ছিলেন । ২৯ মাঘ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের সকালে ঠাকুর অনন্তনাথের ঘরের জানালার সামনে গিয়ে জানতে চাইলেন– 'অনন্ত তোর কি কষ্ট হচ্ছে? অনন্তনাথ অতিকষ্টে বঙ্কিমদার কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বল হাত দুটো জড়ো করে ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে ইশারায় নিবেদন করেন– বাক্ শক্তি নেই । ঠাকুর বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে ফিরে আসার অল্পক্ষণ পরেই তার স্থূল সত্তার চির অবসান ঘটে । মহারাজ অনন্তনাথ রায়ের প্রথম স্মৃতি বার্ষিকীতে শ্রীশ্রীঠাকুর শিষ্যবর্গের প্রতি যে আবেগঘন আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা উদ্ধৃত হলো ।

রা

"অস্তিবর্ধনপরেষু,

এই কাঙ্গাল আমাকে–

প্রথমেই যারা গ্রহণ করেছিল, তারা মাত্রই ছিল দুইজন । সে একজন আমার কৈশোরের ছিল খেলার সাথী– আমার অনন্ত মহারাজ– আর একজন– কিশোরীমোহন দাস । একজনই মাত্র আছে– আর একজন– সে চলে গেছে– এই দুনিয়ার মানুষের স্থূলদৃষ্টির অন্তরালে– বিরহ ও বেদনার ঢেউয়ে পারিপার্শ্বিক সব অন্তর হলদল করে– সেদিন এইতো এলো ঐ আসে– সেই ২৯ মাঘ– সেদিন আমার পায়ের তলা থেকে লহমায় দুনিয়াটা যেন সরে গিয়েছিল, আকাশটা হয়ে গিয়েছিল নীলহারা ফাঁকা ।

ঐ দিনে কি কেউ ভাই তোরা– তার স্মৃতির আগুন জ্বালিয়ে– সেই তার স্মৃতি তর্পণ করে শ্রদ্ধার দানে এই পারিপার্শ্বিককে তৃপ্ত করে তার এই আমার আগুন-ছোঁয়া প্রাণ প্রত্যেক প্রাণে জ্বালিয়ে দিবি না?

কে আছো দরদী! আমার এই ক্ষীণ ডাকে প্রাণের সুরের টানে– চলে এস শ্রদ্ধা তর্পণে– যা দিতে সাধ্য– তাই নিয়ে ।

সৎসঙ্গ, পাবনা — দীন
১৮ মাঘ, ১৩৪২ সন । — তোমারই
'আমি' "১৪

ইষ্টের প্রতি ভক্তের ভালবাসার টান কেমন হতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ অনন্তনাথের জীবনাচার । এই মহাজীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ প্রতিটি ভক্তের একান্ত বাঞ্ছিত বিষয় । ইষ্টগ্রহণের পর নিয়মিত নাম-ধ্যান, সাধন-ভজনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । এই বোধ ও প্রত্যয়ে যিনি সদা সচেষ্ট ও আচরণশীল তিনিই যথার্থ অর্থে ঠাকুরকে ভালবাসেন । নিত্যদিন ঠাকুরের বলাগুলি জীবনাচারে অঙ্গীভূত করে চলার অপর নামই তাঁকে ভালবাসা ।

তথ্যপঞ্জী

১ । সত্যানুসরণ– শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, অধ্যায়– দুর্বলতা ।
২ । ঐ ঐ অধ্যায়– কাজের সংকেত ।
৩ । প্রার্থনাস্তোত্র–আচমন ।
৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪ । শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র– ব্রজগোপাল দত্তরায় ।
৮ । শ্রীশ্রীমা, মহারাজ এবং হেমকবি– স্মৃতিচারণ, শ্রীপঞ্চানন সরকার ।
১৩ । ভক্তবলয়– ফণিভূষণ রায় ও শিখা রায় ।

সন্দীপনায় যে কোন লেখা পাঠাতে এই মেইল নাম্বারগুলোতে পাঠান–
E-mail: tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

চিরঞ্জীব বনৌষধি

(১ম খণ্ড)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য

বিম্বী

বিম্বীফলের রংয়ের রূপ দিতে গিয়ে, বোধ করি কবির মাথা যতটা ঘেমেছে, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে কবিরাজেরও মাথা কম ঘামেনি। তাই ভাবছিলাম কবি বড় না কবিরাজ বড়? তবে বিচারে দেখা যায়, কবি তো রচনা করেন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাবছায়া নিয়ে; কিন্তু কবিরাজ কাব্য রচনা করেন অস্থি-মজ্জা থেকে আরম্ভ ক'রে দেহের যত বস্তু আছে তাদের নিয়ে; শুধু তাই নয়, প্রকৃতির মৌল উপাদান, যেমন আলো, বাতাস, মাটি, জল, এ থেকে উদ্ভূত যাবতীয় পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের প্রকৃতির ও বিকৃতির যথার্থ বাস্তবরূপ জানাতে রচনা করেছেন কাব্য ও উপাখ্যান এবং এসবের বিকৃতি ঘটলে যে ব্যথা-বেদনার উদ্ভব হয়, তার উপশমের পথেরও সন্ধান দিয়েছেন। এমনি একটি অযত্নসম্ভূত ভেষজলতা বিম্বীকে কেন্দ্র করেও কবি ও কবিরাজের সমীক্ষণ; তাই গ্রাম্য কবির চোখে–

বুলবুলির যে সোহাগ জাগে বিম্বীফলের রঙে।
প্রাণ ভ'রে সে খায় যে চুমু মধুযামিনীর ঢং-এ॥
মাকাল ফলের রঙটা দেখে মনে জাগায় সাড়া।
খাই না কেন, ভাবে কোকিল, কিন্তু কাকে করে তাড়া॥

কাব্যে বিম্বীফলের রূপের বর্ণনায় সংস্কৃত কবি লিখেছেন–

বিম্বাধরাঞ্জনৈ বির্ম্বে গুঞ্জা ফলমিতি ভ্রমাৎ।
চৌরেণাপহৃতং সর্বং বিনা নাসাগ্র মৌক্তিকম্॥

এর অর্থ হ'চ্ছে–নিদ্রিতা তরুণীর সব অলংকার চোরে নিয়ে গেল, কিন্তু নাকের মুক্তাটি নিল না, কারণ নাকের মুক্তোটিতে প'ড়েছিল বিম্বীফলের কান্তি, অধর ও ওষ্ঠ দুটির প্রতিবিম্ব, আর চোখের কাজলের প্রতিফলন প'ড়েছিল মুক্তোর উপরটায়, তাই মুক্তোটি দেখাচ্ছিল ঠিক যেন কু'চ ফলের মত (গুঞ্জা–Abrus precatorius) এই তুচ্ছ ফল ব'লেই সে নেয়নি।

কবি তো এই দেখলেন, এখন কবিরাজ কি দেখলেন দেখি–

ত্বং বর্ণা ব্যনক্তি বিম্বা ওষধীঃ অর্বন্তমাশু সাদন্যুং বিদথ্যুম্।
ব্যখ্যৎ চ ককুভা রিষ্যৎ পৃথিব্যা আগাদ্ দধৎ রত্না॥

(অর্থ্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৯১। ১১২। ১৮)

এই সুক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন–

ত্বং বিম্বা বিং=কান্তিং বুন্ অচ্ তুণ্ডিকেরীতি। অর্বন্তং=উৎক্লেশং আশু সাদন্যুং সাধুং বিদথ্যুং দদাতু। অন্তঃ ওষধীণ্ড পৃথিব্যা রত্না, ককুভ্য কং=বাতং অপি কান্ত্যা স্কুভ্নাতি যা সা এব ত্বং প্রকাশয়সি। রিষ্যৎ ক্লেদং বিহায়সি ইতি রিষ্যতি, আগাৎ অগ্রেচর স্বভাবা।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো– তুমি বিম্বা, কান্তি তোমার সহজাত (তুণ্ডিকেরী) অর্থাৎ তুণ্ড মুখ তার কান্তি মুখ্য বা ছবি তোমাতে। তুমি গৃহে থাকা ভেষজ, তোমার কান্তি বায়ুও প্রকাশ করে। তুমি উৎক্লেশ ক্লেদকে আশু দূর করে দাও।

অতএব পরিষ্কার ধারণা করা যায়, কবি আর কবিরাজের প্রভেদ কোথায়। ঋষি কবিরাজ দেখেছেন বিম্বফলের কান্তি যে মুখকান্তিকে শুধু অগ্রণী করেই দেয় তাই নয়, তার কান্তি এত তরল যে বায়ুও তাকে বহন ক'রে নিয়ে যায়, যে গৃহে থাকার আমন্ত্রণ পায়। কারণ সে ভেষজ, অর্থাৎ ভয় দূর করে।

কোন কারণে কেহ বিষ ভক্ষণ ক'রলে, অজীর্ণে ভুগতে থাকলে, আমাশয়ের কৃমিজাত ক্লেদে আক্রান্ত হ'লে, অথ বা অরুচি বা অতৃপ্তিকর কিছু বা মশা মাছি পেটে গেলে তার প্রতিকারের জন্য শ্রেষ্ঠ ভেষজ 'বমনকার' দ্রব্যের উপযোগ অর্থাৎ নির্বাচন; কবিরাজের দৃষ্টিতে ব'লবো–এটি বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে বমনকারক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভেষজ। মহীধর সংস্কৃত পরিভাষায় বলেছেন তুণ্ডিকেরী, আর বাংলায় এর পরিভাষা 'তেলাকুচা', অর্থাৎ তেল-চিক্কণ; তেল থেকে লোকায়তিক ভাষায় তোলা আর চিক্কণটা কুচা হ'য়ে গিয়েছে।

বৈদ্যকের নথি

তা যাক, এখন দেখি এই বিম্ব বা তেলাকুচার ব্যবহার বেদের পরবর্তীকালে রচিত সংহিতাগুলির কোথায় কি আছে।

চরক সংহিতার সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে 'বমনোপগ' (বমনোপযোগী) ভেষজ পর্যায়ে, বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে তো আছেই, তা ছাড়া সিদ্ধিস্থানের ২য় অধ্যায়ে শ্লেষ্ম রোগের প্রসঙ্গে সেখানেও এই বিম্বীর ভৈষজ্য বিধান।

তারপর সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ে বিম্বীর গণ পর্যায়ে রস, গণের বৈশিষ্ট্য কি তা বলা হয়েছে; আর ৩৮ অধ্যায়েও এবং এটি মিষ্ট রসাস্বাদ হ'লে কি গুণ হবে তা বলা হয়েছে ৩৯ অধ্যায়ে ।

এর পর বাগ্‌ভটে এসে সূত্রস্থানের ১৫ অধ্যায়ে তিক্তরস বিম্বী এবং মিষ্টরস-সম্পন্ন হ'লে যে তার নাম তুণ্ডিকেরী–তা বলা হ'য়েছে বাগ্‌ভট গ্রন্থের ২১ অধ্যায়ে । নিত্য ভোজ্য হিসেবে 'তুণ্ডিকেরী' । এটি আরও স্পষ্ট করেছেন টীকাকার অরুণ দত্ত মহাশয় ।

প্রতিটি সংহিতার যোগগুলির অর্থকে আরও সহজ ক'রে নিয়ে বৈদ্যাককুল এই তেলাকুচার মূল, পত্র ব্যবহার করে আসছেন; তবে ঔষধার্থে তিক্তরস সম্পন্ন বিম্বীকেই ব্যবহার করা হয় । আর মিষ্টরস তুণ্ডিকেরীকে আহার্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় । এখানে একটা কথা ব'লে রাখি, এই মিষ্টরস তুণ্ডিকেরীই আমাদের দেশের সর্বজনগ্রাহ্য 'কুদঁরী' ফল; যেটা বিহার বা উত্তরপ্রদেশের সাধারণে তরকারি হিসেবে রান্না করে খেয়ে থাকেন ।

পরিচিতি

অযত্নসম্ভূত লতাগাছ, বাগানের বেড়ায় অথবা কোন গাছকে আশ্রয় ক'রে জন্মে থাকে–বাংলা কেন, ভারতের প্রায় সর্বত্রই হয় । পাতার আকার পাঁচকোণা, ব্যাস ৪/৫ ইঞ্চি পর্যন্ত হ'তে দেখা যায় এবং তার কিনারা (ধার) করাতের ছোট দাঁতের মত কাটা; পাতার বোঁটা আন্দাজ এক ইঞ্চি, প্রায় বারোমাসই এই লতাগাছে ফুল হয়, তবে শীতকালে বিশেষ হ'তে দেখা যায় না, আর সব ফুলেই ফল হয় না । এই সব ফলের বোঁটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা, আর যেসব ফুলে ফল হয় তার বোঁটা আধা ইঞ্চির মত লম্বা হয় । ফলগুলি লম্বায় ১½/২ ইঞ্চির বেশী হতে দেখা যায় না । ফলগুলি আমড়া ঝাঁটি পটোলের মত দেখতে হ'লেও আকারটা যেন পটোলের মত । কিন্তু ফলের উপরটা মসৃণ (তেলা), কাঁচায় সবুজ রং, গায়ে সাদা ডোরা দাগ, পাকলে লাল হয় । কাঁচা বা পাকা কোন অবস্থাতেই খাওয়া যায় না, কারণ ফলের শাঁস তিতো (তিক্ত) এবং বমির উদ্রেক হয়; এর মধ্যে বহু বীজ আছে, অনেক পাখীর এটা প্রিয় খাদ্য, কিন্তু এদেশে অনেকে এর ডাঁটা-পাতার ঝোল ক'রে খেয়ে থাকেন । এই লতাগাছটির বোটানিকাল্ নাম Coccinia cordifolia Cogn. অথবা Coccinia indica W&A, পূর্বে এটির নাম ছিল Cephalandra indica Naud. এই গাছটির সিনোনিম্ (Synonym) বদলে গেলেও এদের ফ্যামিলি সেই Cucurbitaceae. ঔষধার্থে ব্যবহার হয় ফল, পাতা, লতা ও মূলের রস ।

এ ভিন্ন কি-গাছে আর কি-ফলে, ঠিক একই রকম দেখতে কিন্তু স্বাদে তিতো নয়, আর একটা ফল বাজারে তরকারি হিসেবে বিক্রি হয়, তাকে বলে কুদঁরি বা কুন্দরুকি; তাকে অনেকে মিষ্টি তেলাকুচো বলে থাকে ।

লোকায়াতিক ব্যবহার

১ । সর্দিতে ঃ– ঋতুকালের বিবর্তনে যে সর্দি হয়, সেই সর্দিকে প্রতিহত ক'রতে পারে, যদি তেলাকুচা পাতা ও মূলের রস ৪/৫ চা-চামচ একটি গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে খাওয়া যায়; তা হ'লে এর দ্বারা আগন্তুক শ্লেষ্মার আক্রমণের ভয় থাকে না, তবে পাতার ওজনের সিকি পরিমাণ মূল নিলেই চলে ।

এ সম্পর্কে একটি প্রবচন আছে–

প্রাবৃষি ন ভ্রাম্যতি শরদি ন ভক্ষতি । ভক্ষতি হিম-শিশিরান্তে । স্বপিতি নিদাঘে ভ্রমতি বসন্তে সোহরুক সোহরুক সোহরুক্॥

একটি বৃক্ষের শাখায় একটি পাখীই যেন কোহরুক্ কোহরুক্ কোহরুক্ ধবনি ক'রছিলো । তাই কবির ভাষায় তার উত্তর দিয়েছিলেন, সেই রোগগ্রস্ত হয়, যে প্রাক-বর্ষায় অর্থাৎ বর্ষার প্রাক্‌কালে জলে ভিজে বা হেঁটে যায় এবং শরৎকালে যে খুব বেশী পেট ভরে খায় তারা পীড়িত হয় । হেমন্তে ও শিশিরে যে পেট ভ'রে না খায়, আর গ্রীষ্মের দুপুর ছাড়া যে দুপুরে ঘুমোয়, সেও পীড়িত হয় এবং বসন্ত ঋতুর ঊষা ও ঊষসীতে অর্থাৎ ভোরে ও গোধূলিকালে যে ভ্রমণ না করে সেও পীড়িত হয় ।

২ । অধোগত রক্তপিত্তে ঃ– জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না অথচ টাটকা রক্ত পড়ে, অর্শের কোন লক্ষণই পূবে বোঝা যায়নি; এক্ষেত্রে মূল ও পাতার রস ৩ চা-চামচ গরম ক'রে খেলে ঐ রক্তপড়া ২/৩ দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে ।

৩ । আমজ শোথে ঃ– যাঁদের আমাশা প্রায়ই লেগে থাকে, পা ঝুলিয়ে রাখলেই ফুলে যায়, এক্ষেত্রে মূল ও পাতার রস ৩/৪ চা-চামচ প্রত্যহ একবার ক'রে খেলে ঐ ফুলোটা চলে যাবে । তবে মূলরোগ আমাশার চিকিৎসা না করলে এ ফুলো আবার আসবে ।

৪ । পাণ্ডু রোগে ঃ– (শ্লেষ্মা জন্য) এটির বিশিষ্ট লক্ষণ দেওয়া হয়েছে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩২০ পৃষ্ঠায় । এইরূপ ক্ষেত্রে এর মূলের রস ২/৩ চা-চামচ গরম না ক'রেই সকালের দিকে একবার খেতে হবে ।

৫ । শ্লেষ্মাজন্য জ্বরে ঃ– এইসব জ্বরে তেলাকুচা পাতা ও মূল একসঙ্গে থেতো ক'রে ২/৩ চা-চামচ রস একটি গরম

ক'রে সকালে ও বৈকালে ২ বার ক'রে দিন দুই খেলে জ্বরটা ছেড়ে যায় । এ জ্বরে সাধারণতঃ মুখে খুবই অরুচি, এমনকি জ্বর-ঠুঁটোও বেরোয়, আবার কারুর কারুর মুখে ঘাও হয় ।

৬ । হাঁপানির মত হ'লে ঃ– আসলে বুকে সর্দি বসে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হ'চ্ছে, পূর্বে বংশপরম্পরায় হাঁপানি বা এক্‌জিমা অথবা হাতের তালু ও পায়ের তলায় অস্বাভাবিক ঘাম হওয়ার ইতিহাস নেই, এইরকম যে-ক্ষেত্র সেখানে এই তেলাকুচোর পাতা ও তার সিকিভাগ মূল একসঙ্গে থেতো ক'রে তার রস ৩/৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে খেলে ঐ সর্দিটা তরল হ'য়ে উঠে যায় ।

৭ । শ্লেষ্মাজন্য কাসিতে ঃ– এই কাসিতে শ্লেষ্মা (কফ) একেবারে যে ওঠে না তা নয়, কাসতে কাসতে বমি হ'য়ে যায় তাও নয়, এই কাসিতে সর্দি (কফ) কিছু না কিছু ওঠে, তবে খুব কষ্ট ক'রে । এই রকম ক্ষেত্রে মূল ও পাতার রস ৩/৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে, ঠাণ্ডা হ'লে আধ চা-চামচ মধু মিশিয়ে (সম্ভব হ'লে) খাওয়ালে ঐ শ্লেষ্মা তরল হ'য়ে উঠেও যায় ও কাসিরও উপশম হয় ।

৮ । জ্বরভাবে ঃ– জ্বর যে হবে তার সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, মাথা ভার, সর্বশরীরে কামড়ানি, এই অবস্থায় কাঁচা তেলাকুচো ফলের রস ১ চা-চামচ একটু মধু সহ সকালে ও বৈকালে ২ বার খেলে ঐ জ্বরভাবটা কেটে যাবে, তবে অনেক সময় একটু বমি হ'য়ে তরল সর্দিও উঠে যায়; এটাতে শরীর অনেকটা হালকা বোধ হয় । তবে যে ক্ষেত্রে এই রোগে বায়ু অনুষঙ্গী হয় সেখানে কাজ হবে না, যেখানে পিত্ত অনুষঙ্গী হয় সেখানেও কাজ হবে না; কেবল যেখানে শরীরে কফের প্রবণতা আছে, তার সঙ্গে ডায়েবেটিস্, সেখানেই কাজ ক'রবে । এ ক্ষেত্রের লক্ষণ হবে থপ্‌থপে চেহারা, কালো হ'লেও ফ্যাকাসে, কোমল স্থানগুলিতে ফোড়া হ'তে চাইবে বেশী, এ'দের স্বাভাবিক টান থাকে মিষ্ট রসে, এঁরা জলা জায়গার স্বপ্ন বেশী দেখেন । রমণের স্থায়িত্বও নেই যে তা নয়, এই বিকার যে কেবল বৃদ্ধকালে আসবে তা নয়, সব বয়সেই আসতে পারে । এদের ক্ষেত্রে আলু খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া, ভাত বেশী খাওয়া নিষেধ ক'রেছেন আয়ুর্বেদের মনীষীগণ, যাঁরা বায়ু বা পিত্ত বিকৃতির সঙ্গে ডায়েবেটিস্ রোগে আক্রান্ত হন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সব বর্জনের খুব উপযোগিতা আছে বলে আয়ুর্বেদের মনীষীগণ মনে করেন না ।

৯ । বমনের প্রয়োজনে ঃ– অনেক সময় বমি করানোর দরকার হয়, যদি কোন কারণে তাঁর পেটে কিছু গিয়ে থাকে বা খেয়ে থাকেন–সেক্ষেত্রে তেলাকুচো পাতার রস ৫/৬ চা-চামচ কাঁচাই অর্থাৎ গরম না ক'রেই খেতে হয়, এর দ্বারা বমন হয়ে থাকে ।

১০ । অরুচিতে ঃ– যে অরুচি শ্লেষ্মাবিকারে আসে অর্থাৎ সর্দিতে মুখে অরুচি হ'লে তেলাকুচার পাতা একটু সিদ্ধ ক'রে, জলটা ফেলে দিয়ে শাকের মত রান্না করে (অবশ্য ঘি দিয়ে সাঁতলে রান্না ক'রতে হবে) খেতে বসে প্রথমেই খাওয়া; এর দ্বারা ঐ অরুচিটা সেরে যাবে ।

১১ । ডায়বেটিসে ঃ– অনেক সময় আমরা মন্তব্য করি, তেলাকুচার পাতার রস খেলাম, আমার ডায়েবেটিসে সুফল কিছুই হ'লো না; কিন্তু একটা বিষয়ে যোগে ভুল হয়ে গিয়েছে । এই রোগ তো আর এক রকম দোষে জন্ম নেয় না । এক্ষেত্রে তেলাকুচোর পাতা ও মূলের রস ৩ চা-চামচ করে সকালে ও বৈকালে একটু গরম ক'রে খেতে হবে । এর দ্বারা ৩/৪ দিন পর থেকে তার শারীরিক সুস্থতা অনুভব করতে থাকবেন ।

১২ । স্তন্যহীনতায় ঃ– মা হলেও স্তনে দুধ নেই, এদিকে শরীর ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে, এঁকে কাঁচা সবুজ তেলাকুচা ফলের রস একটু গরম ক'রে ছেঁকে তা থেকে এক চা-চামচ রস নিয়ে ২/৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে ২ বার খেলে ৪/৫ দিনের মধ্যে স্তনে দুধ আসবে ।

১৩ । অপস্মার রোগে ঃ– এটি যদি শ্লেষ্মাজন্য হয়, তবে এ রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ হবে রোগাক্রমণের পর থেকে ভোগকালের মধ্যে রোগী প্রস্রাব ক'রে থাকে । এদের দাঁড়ানো বা চলাকালে কখনও রোগাক্রমণ বড় দেখা যায় না । খাওয়ার পর ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা খুব ভোরের দিকে এদের রোগাক্রমণ হবে । এদের (এ রোগীর) মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোয় না । এটা যদি দীর্ঘদিন হ'য়ে যায় অর্থাৎ পুরাতন হ'লে যদিও নিরাময় হওয়া কষ্টসাধ্য, তথাপি এটা ব্যবহার করে দেখুন । এই ক্ষেত্রে তেলাকুচার পাতা ও মূলের রস একটু গরম ক'রে, ছেকে নিয়ে ২ চা-চামচ ক'রে প্রত্যহ খেতে হবে । তবে এটা বেশ কিছুদিন খাওয়ালে আক্রমণটা যতশীঘ্র আসছিলো সেটা আর আসবে না ।

এই নিবন্ধের সমাপ্তির পরে এইটাই মনে হ'চ্ছে–বৈদিক যুগে ত্রিশূল ছিল না । সত্যি, কিন্তু আমাদের বায়ু, পিত্ত ও কফ যেন ত্রিশূলের তিনটি ফলা । এই ফলার ধারটা বুঝে যদি খোঁচাটা দেওয়া যায়, সে খোঁচায় কাজ হবেই; এইটাই ছিল চরকীয় ধারার বৈশিষ্ট্য । আমরা না প'ড়ে বিদ্যেসাগর হ'য়েই না আমাদের আজ এই অধঃপতন!

সৎসঙ্গ সমাচার

যশোর

গত ১ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ রবিবার মণিরামপুর থানাধীন চিনাটোলা নিবাসী শ্রীসমিতকুমার কণ্ডুর বাড়ীতে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা, মাতৃমঙ্গল ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে পাঠ করেন– শ্রীসমীতকুমার কুণ্ডু, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.), শ্রীমতিরেখরাণী দে ও শ্রীসুকুমার দে (স.প্র.ঋ.) ।

এরপর শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় ।শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন– শ্রীঅশোককুমার কুণ্ডু, শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ (স.প্র.ঋ.), শ্রীসুকুমার দে (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ।

গত ১৩ আশ্বিন ১৪১৩ বঙ্গাব্দ , ঝিকরগাছা থানাধীন মারশিয়া নিবাসী শ্রীপ্রদীপকুমার গাঙ্গুলী মহোদয়ের গৃহে এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য(স.প্র.ঋ.) মহোদয় ।প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ ও গীতা পাঠ করেন শ্রীকোমলকৃষ্ণ মজুমদার ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) মহোদয় । এরপর শ্রীগণেশচন্দ্র পাল (স.প্র.ঋ.) মহোদয় ও শ্রীস্বপনকুমার হালদার (স.প্র.ঋ.) মহোদয়ের সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর আলোকে বক্তব্য রাখেন শ্রীশেখরকুমার মজুমদার, শ্রীগণেশচন্দ্র পাল (স.প্র.ঋ.), শ্রীস্বপনকুমার হালদার (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) মহোদয় ।

গত ২৬ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার মণিরামপুর থানাধীন সৈয়দমামুদপুর নিবাসী শ্রীসুকুমার কুণ্ডু (স.প্র.ঋ.) মহোদয়ের বাড়ীতে শুভ বিজয়া উপলক্ষ্যে এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) মহোদয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা, নারীর নীতি ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন– শ্রীমিঠুনকুমার কুণ্ডু, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.), শ্রীমতি পূর্ণিমারাণী মজুমদার ও কুমারী নিপারাণী পাল ।

এরপর শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ও অর্চনারানী দের সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । 'বিজয়া মায়ের বিলয়ন নয়কো বরং বিশেষরূপে সৃষ্টি' এই আলোকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে মাতৃপূজা এই শিরোণামে বক্তব্য রাখেন – শ্রীসুকুমার কুণ্ডু (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ।

গত ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ সৈয়দমামুদপুর নিবাসী শ্রীঅশোককুমার দেবনাথের বাড়ীতে এক সৎসঙ্গ হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃ মঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন– শ্রীসুকুমার কুণ্ডু (স.প্র.ঋ.), শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ও নিপারাণী পাল ।

এরপর শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় ।শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর আলোকে বক্তব্য রাখেন শ্রীনিরঞ্জনকুমার দেবনাথ, শ্রীসুকুমার কুণ্ডু (স.প্র.ঋ.), ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ।

গত ৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ শনিবার চিনাটোলা নিবাসী গীতারাণী কুণ্ডুর বাসভবনে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) বাসভবনে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ হয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা, নারীর নীতি ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন– শ্রীমিঠুনকুমার কুণ্ডু, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.), কুমারী টুম্পারাণী দেবনাথ ও কুমারী নিপারাণী পাল ।

এরপর শ্রীস্বপনকুমার হালদার (স.প্র.ঋ.), শ্রীভবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (যাজক) ও শ্রীগৌতমকুমার কুণ্ডু মহোদয়ের সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা শুরু হয় ।শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীসন্তোষকুমার হাজরা, শ্রীপরিমলকুমার বিশ্বাস (যাজক), শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ (স.প্র.ঋ.),

শ্রীস্বপনকুমার হালদার (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ।

গত ৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ বুধবার চিনাটোলা নিবাসী শ্রীসুকুমার দে (স.প্র.ঋ.) মহোদয়ের গৃহাঙ্গনে তাঁর প্রয়াত পিতৃদেবের আত্মার শান্তি কামনায় এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় । সেখানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুকুমার কুণ্ডু (স.প্র.ঋ.) মহোদয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন– শ্রীমিঠুনকুমার কুণ্ডু, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ও নিপারাণী পাল ।

এরপর শ্রীস্বপনকুমার হালদার (স.প্র.ঋ.)মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনাসভা শুরু হয় । 'পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলেই হয় সাম্যপ্রাণ' শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণীর আলোকে বক্তব্য রাখেন শ্রীসুকুমার দে (স.প্র.ঋ.), শ্রীরঞ্জিতকুমার দাস, শ্রীসুকুমার রায় (স.প্র.ঋ.), শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ (স.প্র.ঋ.), শ্রীস্বপনকুমার হালদার (স.প্র.ঋ.), শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীসুকুমার কুণ্ডু (স.প্র.ঋ.) ।

গত ৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মণিরামপুর থানাধীন সৈয়দমামুদপুর নিবাসী ইষ্টপ্রাণ শ্রীসুকুমার কুণ্ডু মহোদয়ের গৃহে তাঁরই প্রয়াত মাতৃদেবীর আত্মার শান্তি কামনায় এক সৎসঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন– শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ ।

প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে পাঠ করেন শ্রীমনোরঞ্জনকুমার দে, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.), নিপারাণী পাল ও সুকুমার রায়(স. প্র.ঋ.) ।

এরপর শ্রীস্বপনকুমার হালদার (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীসন্তোষকুমার হাজরা মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনাসভা শুরু হয় । 'মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলে হয় কৃতি তত'–এই বাণীর আলোকে আলোচনা করেন– শ্রীসুকুমার কণ্ডু (স.প্র.ঋ.), শ্রীমনোরঞ্জনকুমার দে, শ্রীবিশ্বজিৎ সরকার, শ্রীসন্তোষকুমার হাজরা, শ্রীপরিমলকান্তি বিশ্বাস (যাজক), শ্রীসুকুমার রায় (স.প্র.ঋ.), শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ (স.প্র.ঋ.), শ্রীস্বপনকুমার হালদার (স.প্র.ঋ.), শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ ।

গত ১৪ অগ্রহায়ণ১৪২৩ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার মনিরামপুর থানাধীন ঝাঁপা মাতৃ মন্দিরে শ্রীরমেশচন্দ্র পাল মহোদয়ের উদ্যোগে শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ অধিবেশন হয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে পাঠ করেন– শ্রীদিলীপকুমার পাল (অধ্বর্যূ), শ্রীপ্রদীপকুমার গাঙ্গুলী ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ।

এরপর শ্রীস্বপনকুমার হালদার (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীগণেশচন্দ্র পাল (স.প্র.ঋ.) মহোদয়ের সঙ্গীত দিয়ে আলোচনাসভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর আলোকে বক্তব্য রাখেন শ্রীপ্রদীপকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীদিলীপকুমার পাল (অধ্বর্যূ), শ্রীগণেশচন্দ্র পাল (স.প্র.ঋ.), শ্রীস্বপনকুমার হালদার (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল ।

যশোর

শুভ পুরুষোত্তম মাস "ভাদ্রের" যাজন পরিক্রমাকে ঘিরে চিনাটোলা-সৈয়দমাহমুদপুর আঞ্চলিক শাখা সৎসঙ্গ আশ্রমের কর্মীবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে মাসব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে সৎসঙ্গ অধিবেশনের মাধ্যমে যাজন পরিক্রমা শুরু করে ।

এই যাজন পরিক্রমায় বিশেষভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করেনঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [সঃপ্রঃঋঃ], শ্রী সুকুমার দে [সঃপ্রঃঋঃ] শ্রী স্বপন কুমার হালদার [সঃপ্রঃঋঃ], শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দাস [সঃপ্রঃঋঃ] শ্রীকল্যাণ কুমার হালদার [অধ্বর্য্যু] শ্রীদিলীপ কুমার পাল [অধ্বর্য্যু] শ্রীপরিমল কুমার বিশ্বাস [যাজক] শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবনাথ, শ্রীরনজিৎ কুমার দাস, শ্রীচপল কুমার সাহা, শ্রীবিশ্বজিৎ কুমার সরকার, শ্রীদুলাল চন্দ্র মণ্ডল, শ্রীঅসীম কুমার সেন ও আরও অনেকে ।

[বিঃদ্রঃ উল্লেখ্য যে হঠাৎ করে ঐ অঞ্চলে মারাত্মক প্রবল বন্যায় বিভিন্ন সমতল জলে প্লাবিত হওয়ায় কয়েকদিন যাজন পরিক্রমা বন্ধ থাকে]

চিনাটোলা-সৈয়দমাহমুদপুর আঞ্চলিক শাখা সৎসঙ্গের পুরুষোত্তম মাস পরিক্রমা

তারিখ	বার	গৃহ স্বামীর নাম	গ্রাম	বিনতি প্রার্থনার সময়	আলোচ্য বিষয়
১ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	সুকুমার দে [সঃপ্রঃঋঃ]	চিনাটোলা	৬টা ৩৫ মিঃ	নামে মানুষকে তীক্ষ্ম করে আর ধ্যান মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে
২ ভাদ্র	শুক্রবার	ভীম প্রসাদ দত্ত	করে রাইল	৬টা ৩৪ মিঃ	যজন যাজন ইষ্টভৃতি করলে কাটে মহাভীতি
৩ ভাদ্র	শনিবার	শ্রীসমীর কুমার রায়	হরিণা	৬টা ৩৪ মিঃ	ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন ছিন্নভিন্ন তার জীবন ।
৯ ভাদ্র	শুক্রবার	শ্রীসুকুমার কুণ্ডু [সঃপ্রঃঋঃ]	সৈয়দ মাহমুদপুর	৬টা ২৯মিঃ	পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান সেই ছেলেই হয় সাম্যপ্রাণ
১৪ ভাদ্র	বুধবার	অনিল কুমার ঘোষ	দূর্বাডাঙ্গা	৬টা ২৩ মিঃ	সদাচারে বাঁচে বাড়ে, লক্ষ্মী বাধা তার ঘরে
১৫ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	শ্রীসন্তোষ কুমার দেবনাথ	সৈয়দ মাহমুদপুর	৬টা ২৩ মিঃ	মাছ মাংশ খাসনে আর পেঁয়াজ রসুন মাদক ছাড়
১৬ ভাদ্র	শুক্রবার	শ্রীসুনীল কুমার দাস	রোহিতা	৬ টা ২২ মিঃ	ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন ছিন্নভিন্ন তাঁর জীবন
১৭ ভাদ্র	শনিবার	শ্রীভালানাথ কুণ্ডু	চিনাটোলা	৬টা ২১ মিঃ	সব সমস্যার সমাধান, জানিস ইষ্ট প্রতিষ্ঠান
১৮ ভাদ্র	রবিবার	শ্রীসুনীল কুমার ঘোষ	দূর্বাডাঙ্গা	৬টা ২০ মিঃ	যজন যাজন ইষ্টভৃতি সাধনার ভিত্তিভূমি
১৯ ভাদ্র	সোমবার	শ্রীপ্রশান্ত কুমার পাল	কোমলপুর	৬টা ১৯ মিঃ	ঈশ্বর এক ধর্ম এক প্রেরিত পুরুষ একেরই বার্তাবাহী
২০ ভাদ্র	মঙ্গলবার	শ্রী অশোক কুমার কুণ্ডু	চিনাটোলা	৬ ১৮ মিঃ	সব অবস্থায় রাজী থাক, দুঃখ তোমার কী করবে?
২১ ভাদ্র	বুধবার	শ্রীদিলীপ কুমার রায়	চিনাটোলা	৬টা ১৭ মিঃ	প্রার্থনা মানেই প্রকৃষ্ট রূপে জেনে তাই করা
২২ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	শ্রীমতি গীতারানী কণ্ডু	চিনাটোলা	৬টা ১৬ মিঃ	ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন ছিন্নভিন্ন তাঁর জীবন
২৫ ভাদ্র	রবিবার	শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ	দূর্বাডাঙ্গা	৬টা ১২ মিঃ	না ধরে প্রেরিতে বর্তমান অন্ধতময় হয় প্রয়াণ
২৬ ভাদ্র	সোমবার	শ্রীঅনাথ কুমার চক্রবর্ত্তী	পাঁজিয়া	৬টা ১১ মিঃ	আমাকে ছাড়া কাউকে ভালবেসো না তাতে প্রাণে ব্যাথা লাগে
২৭ ভাদ্র	মঙ্গলবার	শ্রীস্বপন কুমার হালদার [সঃপ্রঃঋঃ]	আম্রকুটা	৬টা ১০ মিঃ	আমাকে ছাড়া কাউকে ভালবেসোনা তাতে প্রাণে ব্যাথ্যা লাগে
২৮ ভাদ্র	বুধবার	শ্রীস্বপন কুমার ঘোষ	দূর্বাগঙ্গা	৬টা ১০ মিঃ	আমিষে বিধান উত্তেজিত অযথা শরীর হয় জর্জরিত
২৯ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	ত্রিপল্লীমাতৃ মন্দির	খতিয়াখালী	৬টা ৯ মিঃ	ভালবাসায় টান কর্মে আনে সফলতা জীবনে উত্থান
৩০ ভাদ্র	শুক্রবার	বাহাদুরপুর শাখা সৎসঙ্গ	বাহাদুরপুর	৬টা ৮ মিঃ	ঐ তিনি যখন যেখানে আবির্ভূত হন সেই স্থানই মানুষের পরমতীর্থ
৩১ ভাদ্র	শনিবার	শ্রীসুনীল কুমার পাল	খেদাপাড়া	৬টা ৭ মিঃ	স্বামীর প্রতি টান যেমনি ছেলেও জীবন পায় তেমনি

সংবাদ প্রেরণ– দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [সঃপ্রঃঋঃ]

সংবাদ পরিবেশনে – শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.)

প্রার্থনার সময়সূচি

(বাংলাদেশ সময়ানুসারে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সূর্যোদয়ের ৩০ মিনিট পূর্বে এবং সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সূর্যাস্তের সাথে সাথে)

মাসের নাম	তারিখ / সময়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
জানুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮
ফেব্রুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.১৯	৬.১৮	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৫			
	সন্ধ্যা	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৪			
মার্চ	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫
	সন্ধ্যা	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৭
এপ্রিল	প্রাতঃ	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৩	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৪	৫.১৩	৫.১২	৫.১২	৫.১১	৫.১০	৫.১০	৫.০৯	
	সন্ধ্যা	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৯	
মে	প্রাতঃ	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৭	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৩	৫.০৩	৫.০২	৫.০২	৫.০১	৫.০০	৫.০০	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৭	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫
	সন্ধ্যা	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৩৮	৬.৩৯	৬.৪০	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৩
জুন	প্রাতঃ	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৭	
	সন্ধ্যা	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	
জুলাই	প্রাতঃ	৪.৫৭	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৯	৪.৫৯	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০১	৫.০১	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৭	৫.০৭	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৯
	সন্ধ্যা	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৭
অগাস্ট	প্রাতঃ	৫.০৯	৫.১০	৫.১০	৫.১১	৫.১১	৫.১২	৫.১২	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০
	সন্ধ্যা	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪৩	৬.৪২	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪০	৬.৩৯	৬.৩৯	৬.৩৮	৬.৩৭	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৫	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩২	৬.৩১	৬.৩০	৬.৩০	৬.২৯	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৬	৬.২৫	৬.২৪
সেপ্টেম্বর	প্রাতঃ	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩০	
	সন্ধ্যা	৬.২৩	৬.২২	৬.২১	৬.২০	৬.১৯	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	
অক্টোবর	প্রাতঃ	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪
	সন্ধ্যা	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৭
নভেম্বর	প্রাতঃ	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৩	
	সন্ধ্যা	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৩	৫.২৩	৫.২২	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.২০	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	
ডিসেম্বর	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭

প্রস্তুতকারক ঃ শ্রীঅসিতকুমার মণ্ডল (সহ-প্রতিঋত্বিক), সহযোগিতায় ঃ শ্রীঅরবিন্দকুমার মণ্ডল (যাজক), সাতক্ষীরা।